লোকসংস্কৃতি গবেষণা গ্রন্থমালা : ২

পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচ

শ্রীসনৎকুমার মিত্র

: পরিবেষক :

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : ১লা জুন ১৯৮৭

প্রচ্ছদ : অপরূপ উকিল

রেখাচিত্র : পল্লব সেনগুপ্ত
তপন কর

আলোকচিত্র : গ্রন্থকার

প্রকাশক :



রুশো মিত্র
লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ
৬০ জেমস লঙ সরণি
কলিকাতা : ৩৪

মুদ্রাকর :
অমলেন্দু সিকদার
জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬৩/১, সূর্য সেন স্ট্রিট কলিকাতা : ৯

বিশিষ্ট চিকিৎসক

অধ্যাপক ডা. পরিমল চন্দ্র দাশ

এম. ডি. [ক্যাল], এফ. আই. সি. এ. [ইউ. এস. এ.],

এফ. সি. সি. পি [ইউ. এস. এ.],

মান্যবরেষু

: লেখকের কিছু বই :

- রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য
- লালন ফকির : কবি ও কাব্য
- পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা
- কর্তাভজা : ধর্মমত ও ইতিহাস [সম্পাদিত]
- বাঘ ও সংস্কৃতি [সম্পাদিত]
- পশ্চিমবঙ্গের লোকবাদ্য
- পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্য
- কর্তাভজা ধর্মের ইতিহাস ও তাঁদের গান
- শেক্সপীয়র ও বাংলা নাটক
- **Folk Life and Lore of West Bengal**

ঃ নিবেদন ঃ

'পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচ' বাঙলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে আমার আর একটি পাদপাত। যেদিকে আমি পা বাড়ালাম সেদিক এতকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলো, আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করলাম সেদিকে আলো ফেলতে। বাঙলার সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত এই পুতুলনাচ নিয়ে এ-পর্যন্ত বাঙলা ভাষায় কোন বই হয়নি—এটিই সেদিক থেকে প্রথম।

আমাদের জানা আছে, বাংলার পুতুলনাচের ঐতিহ্য অনেক পুরানো—সারা ভারতবর্ষের বিচারেও। কিন্তু অন্যত্র ঐ সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আজও জীবন্ত, স্বাস্থ্যবান ও লাবণ্যযুক্ত। বহুমানুষ এখনও ঐসব পুতুলনাচকে তাঁদের প্রীতিতে পৃষ্ঠপোষণায় শ্রীদান করে চলেছেন—রাষ্ট্রীয়ভাবেও তার পরিপোষণা চলছে : 'Rajasthan at present, is giving a lead in the use of puppetry both for educational work and healthy entertainment. Courses have been developed by the Department of Education for teaching puppetry in their scheme of work experience....The Board of Higher Secondry Education, in Rajasthan has adopted puppetry as one of the teaching subjects in classes IX and X.' [D. L. Samar : 'Puppet Theatre in India.' p. 8.]। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এই পুতুলনাচ কিন্তু পাশ্চাত্য বা জাপান অনুকৃত নয়। এঁরা নিজের ঐতিহ্যের প্রতি পেছন ফিরিয়ে, মুগ্ধ হয়ে পরানুকরণ-নিষ্ঠায় আনন্দ প্রকাশ করেন না। কারণ, ঐ একই প্রবন্ধকার ঐ প্রবন্ধেরই অন্যত্র বলছেন : 'The Ramayana Puppet Play produced by the Bharatiya Lok-Kala Mandal, using difficult themes of Ramayana in *traditional Rajasthan techniques* in the modern presentation style was rated as the best play presented in the festival.' এবং

তাঁরা নানা সময়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনাও করেছেন কিভাবে ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচকে ['traditional puppetry'] তাদের সমস্যা থেকে নিষ্ক্রান্ত করে আনতে পারেন। বাঙলার অতি-প্রাচীন পুতুলনাচকে বাঁচাতে, সমৃদ্ধ করতে, তাকে আপন স্বাস্থ্যে ফিরিয়ে এনে আধুনিক জগৎ ও জীবনের উপযোগী করতে আমরা কি করেছি ?—মন্তব্য না করাই ভালো।

যেভাবে পুরুলিয়ার ছৌ-নাচকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিলো, সেইভাবে পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচের অপমৃত্যু রোধ করতে এবং দেশের মাটিতে তার শিকড় রেখে আধুনিক জীবনাচরণের সঙ্গে তাদের যুক্ত করে শ্রী ফিরিয়ে আনতে আমার নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা আছে। যদি সুযোগ ও সহযোগিতা মেলে তবে ঐতিহ্যমণ্ডিত এই কলামাধ্যমেরও প্রাণ বাঁচানো যাবে, উৎসাহ ও শক্তিকে দ্বিগুণিত করা যাবে। শুধু একবার-দু-বার বিদেশে নিয়ে গেলে বা কোলকাতার পাঁচ কিসিমের মেলার মধ্যে এনে হাজির করলেই এদের পক্ষে কোন উপকারই সাধিত হবে না। সুদূরপ্রসারী ও স্থায়ী পরিকল্পনা এবং সহৃদয় মন নিয়ে অগ্রসর হয়ে এই শিল্পকলাকে যাতে স্বাস্থ্যবান করে বাঁচিয়ে রাখা যায় সেই উদ্দেশ্য এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে। কি সুপ্রাচীন ইতিহাস এই পুতুলনাচের পেছনে আছে তা বিদগ্ধ ও রসিকজনের কাছে তুলে ধরে এর প্রতি যদি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনতে পারে এই ছোট্ট বইটি, তবেই আমার সুখ।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি অনেকের কাছ থেকে সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছি। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের পুতুলনৃত্যশিল্পীগণ—যাঁরা অকৃপণভাবে তথ্য সংগ্রহে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। মেদিনীপুর মুগবেড়িয়া কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. শ্রীদিলীপ দত্ত-এর সাহায্য ব্যতিরেকে দস্তানা পুতুল সম্পর্কে অনেক তথ্যই সংগৃহীত হতো না। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীস্বপন রথও আমাকে এ-বিষয়ে সাহায্য করেছেন। কলিকাতার 'ক্রাফট কাউন্সিলে'র শ্রীমতী রুবী পালচৌধুরী মহোদয়া বিগত ৪-১১ এপ্রিল '৮৯ ময়দানে লোককলার উৎসবে ঐ দস্তানা পুতুলের একটি দলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শিল্পীদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন।

এই সূত্রে শ্রীমতী পালচৌধুরীকেও ধন্যবাদ জানাই। অগ্রজপ্রতিম ড. ক্ষেত্র গুপ্ত ও দিদিভাই ড. জ্যোৎস্না গুপ্ত-কে আমার সারস্বত কর্মে নিয়ত উৎসাহ প্রদান করার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

বন্ধুবর সুসাহিত্যিক তপোবিজয় ঘোষ, ড. পল্লব সেনগুপ্ত, ড. দুলাল চৌধুরী, ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার-এর কাছ থেকে লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে নিয়ত যে উৎসাহ ও সম্প্রীতি পেয়ে থাকি এখানেও তার ব্যত্যয় হয়নি, তাঁদের আমার প্রীতি জানাই। 'স্টুডিও রূপা'-র শ্রীঅজিত দাশগুপ্ত আলোকচিত্র পরিস্ফুটনে যত্ন নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। নদীয়ার 'পশ্চিমবঙ্গ পুতুলনাট্য সংঘ'-এর সভাপতি অনুজপ্রতিম শ্রীসুশান্ত হালদার এই গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে অবিরত তাঁর কৌতূহল বজায় রেখে আমার লেখার শ্রমকে আনন্দকর্মে রূপান্তরিত করেছেন, তাঁর জন্য রইল সম্প্রীতি। আমার কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅসিত ব্রহ্ম পুতুলনাচ সম্পর্কে যে এতো তথ্যের ভাণ্ডারী, তা আমার আগে জানা ছিলো না। তিনি নির্বিচারে তাঁর সংগৃহীত তথ্যগুলি ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন।

পরিশেষে, বর্তমান গ্রন্থের একটি খসড়া চেহারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বন্ধুবর ড. ওয়াকিল আমহদের চেষ্টায় ও-বাংলার 'লৌকিক বাঙলায়' আলোকচিত্র সহ প্রকাশিত হয়েছিলো। তাঁকে ধন্যবাদ।

২৫ বৈশাখ ১৩৯৬

বেহালা / কলিকাতা : ৩৪

শ্রীসনৎকুমার মিত্র

● কাঁঠালপাড়ার 'রাধাবল্লভজীউ'-র মেলা ও পুতুলনাচ ●

'এই রাধাবল্লভ কতদিনের তাহা কেহ বলিতে পারে না,···বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্য জীবন হইতে রাধাবল্লভের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।··· রাধাবল্লভের বারমাসে তের পার্বণ হয়। কিন্তু রথে খুব জাঁক হয়।··· রথের সময় বঙ্কিমবাবুদের বাড়ীর দক্ষিণে একটা খোলা জায়গায় বেশ একটি মেলা হয়।···

'আগে পুঁতুলনাচের খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। প্রকাণ্ড এক দোচালার মধ্যে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ রকমের পুতুল হইত। সীতার বিবাহ, লবকুশের যুদ্ধ, কালীয়দমন, এসব ত ছিলই। তার উপর একটা মোকদ্দমার সঙ ছিল—জজসাহেব বসেছেন, পেশকার কাগজ পেশ করিয়া দিল, কাঠগড়ায় আসামী থাকল, সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, উকীলের বক্তৃতা হইল, জজচাহেব রায় দিলেন, অসামীর ফাঁসী শাস্তি হইল, ফাঁসীও হইল। ফাঁসীকাঠে ঝুলিলে আসামীর কাপড়ের ভিতর দিয়া এক রকম পদার্থ বাহির হইতে দেখিয়া ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। আর একরকম সঙ্‌ ছিল—আহ্লাদে পুতুল। তার এক গাল হাসি লাগিয়াই আছে। সে হাত পা নাড়ে আর হাসে।··· এই আটচালায় রথের সময় যাত্রা, নাচ, গান, কীর্তন প্রভৃতি হইত। এখন দুই একদিন যাত্রা হয় মাত্র, আগে আটদিনই খুব জমজমাট থাকিত।'

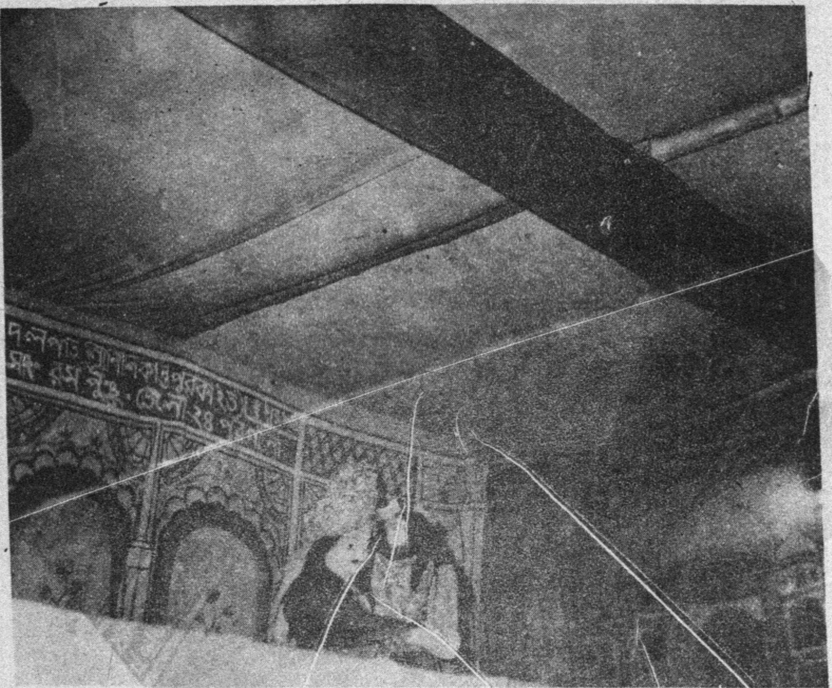
[প্রায় দু-শ বছরের প্রাচীন মেলায় অনুষ্ঠিত পুতুলনাচের বর্ণনা : বঙ্কিমচন্দ্রের ভাইপো শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত 'বঙ্কিম-জীবনী' [১৩১৮ বঙ্গাব্দ] থেকে উদ্ধৃত]।

● সূচীপত্র ●

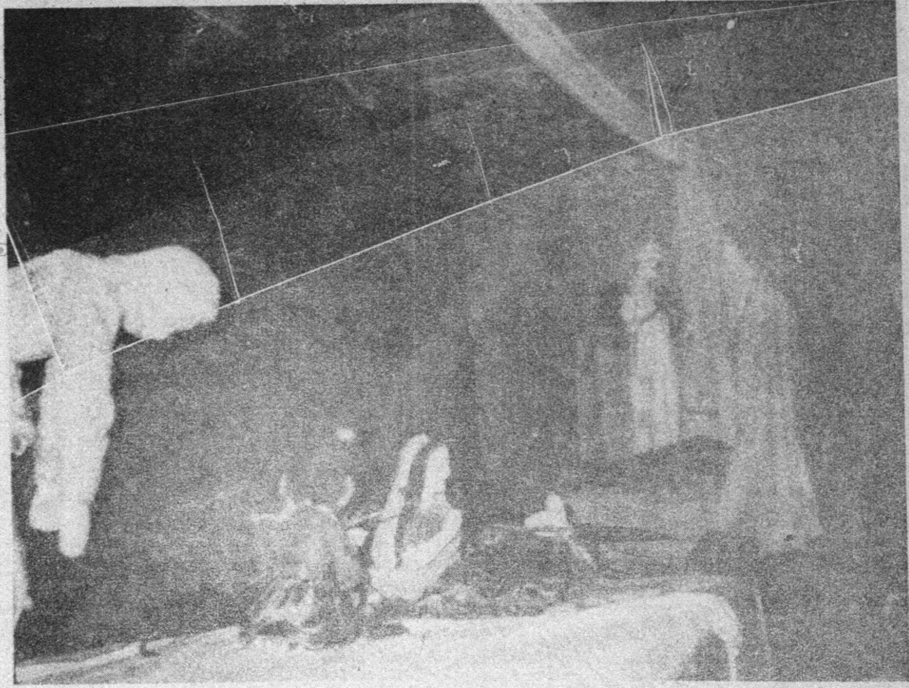
১



ডাঙের পুতুলনাচানোর পদ্ধতি



ডাঙের পুতুলনাচের একটি দৃশ্য



সূতোয়টানা পুতুলনাচের একটি দৃশ্য : মঞ্চ নির্মাণ লক্ষণীয়



স্থতোয়টানা পুতুলনাচ ঃ সাপুড়ে



সুতোয়টানা পুতুলনাচ ঃ রাবণবধ



দস্তানা পুতুলনাচ



ইক্ষুপত্রিকা গ্রামে দস্তানা পুতুলনাচের আসর



একটি দস্তানা পুতুল

১.

ঃ পুতুলনাচের ইতিকথা ঃ

খেলার পুতুল [doll] নিয়ে শিশুর যে খেলা তাকে 'পুতুল খেলা' বলা গেলেও 'পুতুলনাচ' বলা যাবে না। কারণ 'পুতুল' নামক অচেতন জড় পদার্থটি যখন কোন মানুষ অভিনয় পদ্ধতির মাধ্যমে অন্তত কিছু দর্শকের সামনে উপস্থিত করে তখনই তা 'পুতুলনাচ' হিসেবে পরিচিত হয়। তাই বলেছি, শিশুর পুতুলকে নিয়ে খেলা নয়, যখন সে তার মা-বাবা ভাই-বোনেদের সামনে টেবিলে বা ঐ ধরনের উঁচু কিছুর ওপর রেখে তার পুতুলগুলিকে হাঁটিয়ে দৌড়িয়ে জীবন্ত মানুষের ভঙ্গী করায় তখনই তার মাধ্যমে পুতুলের নাচ বা নাটকের আদিম রূপটি প্রকাশিত হয়।[১]

এমন যে 'পুতুলনাচ' তার ঐতিহ্য যেমন প্রাচীন, তেমনি পৃথিবীর প্রায় সব সব সভ্য দেশেই সুপ্রাচীন কাল থেকে তা নানাভাবে ও প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। য়ুরোপের যে লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়, তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেও সেখানে পুতুলনাচ প্রচলিত রয়েছে। অপরাপর দেশের ইতিহাস এর তুলনায় কিছুটা আধুনিক হলেও এশিয়ার মধ্যে চীন, ভারতবর্ষ বা জাভা অঞ্চলে এ-বিষয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যকে খুঁজে পাওয়া যায়, যদিও এই নৃত্য-মাধ্যমটির উৎসের ইতিহাসকে যথাযথভাবে অনুসন্ধান করে পাওয়া একান্তই কঠিন।[২]

তবুও অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকগণ পুতুলনাচের উৎস-সন্ধানে বেরিয়েছেন এবং অবাক বিস্ময়ে দেখেছেন যে পুতুলনাচের মতো একটি কৃত্রিম ও জটিল সাংস্কৃতিক মাধ্যম সুদূর অতীত কাল থেকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে এক সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছে। এই সার্বিক আবেদন সৃষ্টির কারণ কি? তাঁরা দেখেছেন ঃ ১। যদিও তেমন কোন স্পষ্ট প্রমাণাদির দ্বারা

স্থির-নিশ্চয় হয়ে বলা যায় না, তবুও একেবারে অসম্ভব নয় যে নাটকের উদ্ভবের আগেই পুতুলনাচের জন্ম।[৩] ২। এমন সম্ভাবনা কম থাকলেও এটা নিশ্চিত যে পুতুলনাচ এবং নাটক হয়তো সমসময়েই জন্মলাভ করে পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। এবং ৩। উভয়েরই উদ্ভবের মূলে সদৃশ বা সমধর্মী যাদুবিদ্যা [sympathetic magic] ও উর্বরাশক্তির আচারানুষ্ঠানই অনেকখানি সক্রিয়।[৪]

এই বিষয়ের আলোচনার মুখকে আমাদের দেশের দিকে ফেরালে দেখতে পাবো যে, "সেকালে উৎসব উপলক্ষ্যে দুই ধরনের সাহিত্য-সঙ্গীতের আসর বসিত। একটি স্থাবর, অপরটি জঙ্গম। স্থাবর আসর দেব-মন্দিরের সামনে বসিত। অন্যত্র বসিলে দেব-মূর্তি অথবা ঘট-প্রতীক আসরের আগে রাখা হইত। তাহার সামনে গান-নাচ চলিত। দেব-মাহাত্ম্যময় গীতি দীর্ঘ হইলে গেয় বস্তুর পাত্রপাত্রীর 'পাঞ্চালিকা' অর্থাৎ পুতুলরূপ [puppet] দেখানো হইত। অর্থাৎ পুতুলনাচের সঙ্গে চলিত নাট গান।·· এই 'পাঞ্চালী' রীতি পরিপুষ্ট হইয়া একটি বিশিষ্ট ফর্ম গ্রহণ করিবার পর 'পুতুলবাজি' অংশটুকু বাদ পড়িয়া যায়। আর যেখানে পুতুল-বাজি রহিয়া যায় সেখানে গানের অংশ ক্ষীণ হইয়া আসে। 'পাঞ্চালী' গানের সঙ্গে পুতুল-বাজির প্রাচীন যোগাযোগ শুধু নামেই পাই না, [- সংস্কৃতে 'পঞ্চালিকা', পাঞ্চালিকা (পাঞ্চালী + ক স্বার্থে + স্ত্রী আ) মানে কাঠ কাপড় হাতির দাঁত চামড়া ইত্যাদি নির্মিত পুত্তলিকা] কিছু বিবরণও পাই।[৫] যেমন :

ক. 'নৃতু' শব্দটির ব্যবহার ঋগ্‌বেদের পরে পাওয়া যায় নি। ···বাংলা 'নাটুয়া' ও 'লেটো' শব্দ দুটিতে বহু পুরাতন নৃতু শব্দের প্রাচীন অর্থ [—নর্তক, বহুরূপী, পুতুল-বাজিকর, অভিনেতা—] যথাসম্ভব বজায় আছে। ···'নাটক' শব্দটির ব্যবহার সংস্কৃত সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ। তবে তৎসমরূপে আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষায় প্রচলিত আছে। এর মূল অর্থ ছিল—নটকার্য বা প্রদর্শিত হচ্ছে, অর্থাৎ অভিনয় ও পুতুলবাজি এবং নৃত্যগীতের অথবা পুতুলবাজি-অভিনয়ের বস্তু।"[৬]

খ আমরা জানি যে ঋগ্‌বেদের ধর্মানুষ্ঠানে দেব-প্রতিমার কোন স্থান ছিল না। কিন্তু ঐ সব বৈদিক কবির ভাবনায় দেব-প্রতিমার অঙ্কুর পুতুল-বাজির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছিল।

গ আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রণীত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্লবক, কুহক প্রমুখ সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাচ্ছি যাদের বৃত্তি ছিলো যাদুকরের, পুতুল নাচিয়ের বা ভাঁড়ের। যেখানে আদিকৌশিক শব্দের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যারা দেবতার প্রতিমা দেখিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতো। এই প্রতিমাকে নাচাতোও নিশ্চয় [দ্রষ্টব্য : ড সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : 'তিন হাজার বছরের লোকায়ত জীবন' (১৩৮৩) : পৃ ৯৫]।

ঘ. এরপর পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে [খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী] ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সব দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন তার 'থেকে আমরা জানতে পারছি যে তাঁর সময়ে জনসমাজে দৃশ্য ও শ্রব্য আখ্যায়িকা প্রয়োগের তিনটি প্রধান রীতি ছিল। এক হল নৃত্য-অভিনয়, দুই. পুতুল-বাজি, তিন কথকতা।'[৭]

ঙ. এরই সমসময়ে আমরা পাচ্ছি যে অশোকের 'কয়েকটি ক্ষুদ্র গিরি-অনুশাসনে বলা হয়েছে যে এতদিন জম্বুদ্বীপে দেবতারা মানুষের থেকে অমিশালে অর্থাৎ দূরে ছিলেন, এখন দেবতা ও মানুষ মিলিয়ে দেওয়া হলো। দেবতা-মানুষের এ মেশামেশি ঘটানো পুতুল বাজিতে [অথবা পুতুল বাজিযুক্ত মানুষের অভিনয়ে] সম্ভবপর। এই অনুমান স্বীকার করলে বলতে হয় যে অশোক মৌর্য পুতুল বাজির প্রবর্তন করেছিলেন।'[৮]

চ. এই ধারায় অনুসন্ধানের পথ বেয়ে আরও একদিক থেকে বিচার করে বলা হয়েছে, "পুতুলনাচের প্রথা ভারতবর্ষে খুব প্রাচীন। মহাভারতেও এ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুতুলনাচ সূত্রের সাহায্যেই হইত। যিনি সূত্রের সাহায্যে এই অভিনয় কার্য সম্পন্ন করিতেন তাঁহাদিগকে 'সূত্রধর' বলা হইত। পরে দেখা যায় অভিনয় কার্য জীবন্ত মানুষের দ্বারাই করা হইতে লাগিল। তখন যিনি অধিনায়কত্ব করিতেন তাঁহাকে আর সূত্র ধরিয়া অভিনয় করাইতে

হইত না। তবুও তাঁহার পূর্বের সেই 'সূত্রধর' নামটি রহিয়া গেল। এই সূত্রধর হইতে বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় যে পুতুলনাচের রীতি নাটকীয় অভিনয় প্রথার পূর্ববর্তী। নাটকীয় অভিনয়ের উৎপত্তি পুতুলনাচ হইতে না হইলেও এই রীতি কিছু সহায়তা করিয়াছে।"[৯]

এই সংস্কারকেই ঋকৃথ হিসেবে আমরা—বাঙালীরাও গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ ভারতের অপরাপর অঞ্চলে বহু প্রাচীন কাল থেকেই নানাভাবে পুতুলনাচের অস্তিত্ব 'থাকিলেও এই কথা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে বাংলার নিজস্ব কোন পুতুলনাচও একদিন বিকাশ লাভ করিয়াছিল। বাংলার প্রাচীন সাহিত্য কিংবা শিল্পকীর্তিতে ইহার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অপ্রচুর হইলেও ইহার যে সকল নিদর্শন এখনও উদ্ধার করা যায় তাহা হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়।'[১০] যেমন :

ক. 'চৌদ্দ শতকের শেষ দশকে কিংবা পনেরো শতকের প্রথমে রচিত শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ-জোলেখা' [যদিও 'কাব্যটির রচনাকাল বিতর্কিত']-গ্রন্থে পুতুলনাচের উল্লেখ পাচ্ছি এইভাবে :

'পোতলা নাচায় যেহ্ন সূত্রের সাতার।
বাদিয়া আলোপে জেহ্ন সূত রাখি কর।'[১১]

খ. "আনুমানিক চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দে বাঙলাদেশে সংকলিত 'বৃহৎ ধর্মপুরাণে' গঙ্গাধারার সৃষ্টি সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে তাহাতে প্রাচীন-কালের পাঞ্চালী নাটগানের ['পুতুল-প্রতিমাও হতে পারে'] অল্প বর্ণনা আছে।"[১২]

গ. এই পুতুলনাচের জনপ্রিয়তা ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধেও যে যথেষ্ট রকমের ছিলো তা জানতে পারছি 'চৈতন্যচরিতামৃতের' রচনাকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা থেকে :

'কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥'

অতএব আমরা দেখতে পাই যে দেবতার অনুরূপ বা মানুষের প্রতিরূপ সৃষ্টি করে অতিশয় প্রাচীন কালে দেবতা বা মানুষের অনুকৃতির প্রয়োজনেই যে

পুতুলনাচ বা পুতুলবাজির সৃষ্টি হয়েছিল এবং বাংলাদেশ তারই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

১. 'A doll, for instance, is not a puppet and a girl playing with her doll as if it were a living baby is not giving a puppet show, but, if before an audience of her mother and father she makes the doll walk along the top of a table and act the part of a baby, she is then presenting a primitive puppet show': *The Encyclopaedia Britanica* [1982] : Vol : 15 : pp 289-97.

২. Ibid, p. 289.

৩ দ্রষ্টব্য: "পিশেল [Pischel] মনে করেন—'পুতুল-নাচ' থেকেই নাটকের উদ্ভব ঘটেছে। তাঁর যুক্তি, এই যে পুতুল-নাচের জন্ম ভারতবর্ষেই এবং 'সূত্রধর' এবং 'স্থাপক' শব্দ দুটি পুতুল-নাচের প্রযোজনারই প্রমাণ বহন করছে।" [ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য: 'ভারতীয় নাট্যচিন্তা' প্রবন্ধ 'ভরত নাট্যশাস্ত্র' ১৯৮২ : ৩য় খণ্ড : পৃ: ২৫৪]।

৪. 'It may well be asked who such an artificial and often complicated form of dramatic art should possess or universal appeal. The claim has indeed, been made the puppet theatre is the most ancient form of theatre, the origin of the drama itself claims of this nature cannot be substantiated, nor can they be refuted; it is improbable that all human dramatic forms were directly inspired by puppets, but it seems certain that from a very early period in man's development puppet theatre and human theatre grew side by side, each perhaps influencing the other. Both find their origins in sympathetic magic, in fertility rituals, in the human instict to act out that which one wishes to take place in reality'. : Ibid.

৫. ড. সুকুমার সেন: 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' [১৯৭৮ : ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ], পৃ. ১৯।

৬ ড সুকুমার সেন : 'নট-নাট্য-নাটক' [১৯৬৫] পৃ. ১৩।

৭. ঐ. পৃ ১৫।

৮. ঐ, পৃ. ২৩।

৯. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ : 'ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা [১৯৬৫] গ্রন্থের অন্তর্গত 'নাট্যশাস্ত্রে নাটকের উৎপত্তি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য : পৃঃ ৬৩৯। এই প্রসঙ্গে তুলনীয় 'প্রেরণ নৃত্য স্বাভাবিক বেশে নৃত্য, কোন পাত্রপাত্রীর অভিনয় নয়। মনে হয় কথাটি প্রাচীন পুতুলনাচানো হইতে আসিয়াছে। পুতুলকে প্রেরণ করিয়া অর্থাৎ সূতো ধরিয়া নাচাইতে হয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে সংস্কৃত নাটকের সূত্রধর শব্দটি।...ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে যে সূতা ধরিয়া থাকে। অর্থাৎ যে পুতুলবাজির পুতুল নাচায়। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে শব্দটি পুতুলবাজি হইতেই আগত এবং আমাদের দেশে নাটকাভিনয়-রীতির উদ্ভব পুতুলনাচ হইতে।' : দ্রষ্টব্য ৫নং পাদটীকার গ্রন্থ, পৃ. ২০।

১০. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোকনৃত্য' [১৯৮২ : ২য় খণ্ড] পৃ. ৯৬।

১১ ড আহমদ শরীফ : 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' [১৯৭৮ : ১ম খণ্ড], পৃ. ৩৫১।

১২. দ্রষ্টব্য ৫নং পাদটীকার গ্রন্থ, পৃ. ১৬।

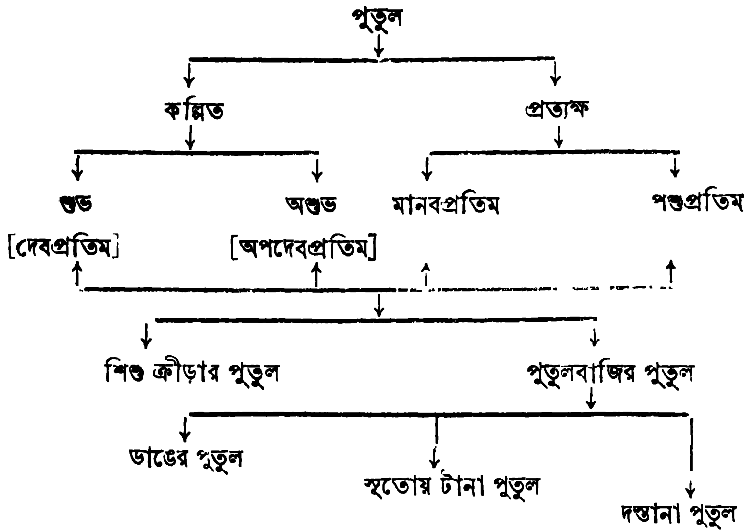


২.

: শ্রেণীবিভাগ :

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেল যে পুতুল হচ্ছে 'প্রতিম' [আভিধানিক অর্থ : 'সদৃশ', 'তুল্য', মতো—'বারিদপ্রতিম স্বনে'—মধুসূদন]-বস্তু। অর্থাৎ এই 'সদৃশ' দেব-দৈত্য-রাক্ষসের হতে পারে, মানুষেরও হতে পারে, অথবা পশুরও। বিশেষণ 'প্রতিম'-এর স্ত্রী লিঙ্গে [+ অ (অঙ্)-ভাববাচ্যে] 'প্রতিমা'। বিশেষ্য 'প্রতিমা'-র অন্যতর অর্থ হলো কল্পিত বা প্রস্তুত মূর্তি। এই মূর্তি বা প্রতিমা মানুষ তৈরি করেছে কেন? এই প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর পাওয়া কঠিন। তবুও সম্ভাব্য এবং অনেকখানি যুক্তি-গ্রাহ্য উত্তর হলো এই যে: ১ আদিম অবস্থায় মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সম্পদদানকারী কোন শক্তি কল্পনা করে ভয়ঙ্কর বা দিব্য-সুন্দর প্রতিমা রচনা করেছে। [প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য যে এই প্রতিমা অষ্টবিধ : শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী। মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥'—শ্রীমদ্ভাগবত]। এর থেকে এসেছে দৈত্য-দানবের বা দেবতার প্রতিমা অথবা পুতুল। ২. পুতুল তৈরির পেছনে কেউ কেউ আদিম মানুষের যাদু বিশ্বাসের ফল লক্ষ্য করেছেন। ৩. কেউ বা মানুষের আপন প্রতিরূপ সৃষ্টির বাসনাকে অনুধাবন করতে চেয়েছেন ['Man created dolls or puppets after his own immage']। ৪ মৃত বা দূরগত মানুষকে স্মৃতিতে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেও পুতুল তৈরি হয়েছে।

এইভাবে আদিমকাল থেকে নানা উদ্দেশ্যে নির্মিত পুতুল থেকে পুতুল-নাচের পুতুল পর্যন্ত যে ক্রমবিকশিত ধারা লক্ষ্য করা যায় আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা তাদেরকে কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। এখানে আমরা একটি ছকের সাহায্যে সেটিকে দেখাবার চেষ্টা করবো:



ওপরের এই শ্রেণীবিভাগকে সামনে রেখে আমরা স্বাভাবিক-ভাবেই পুতুল নাচের বা পুতুলবাজির পুতুলগুলি সম্পর্কেই আমাদের সামাগ্রিক আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখবো। উক্ত শ্রেণীবিভাগ থেকে আমরা এটাও দেখতে পেলাম যে কি শিশুক্রীড়ার পুতুল, কি পুতুলবাজির পুতুল সর্বত্রই কল্পিত এবং প্রত্যক্ষ উভয় শ্রেণীরই পুতুলই দেখা যায় বা তৈরি হয়ে থাকে। এবং এই পুতুল নির্মাণের ক্ষেত্রে সর্বকালেই সব অংশের মানুষই যুগ-কাল-সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগত ভাবনা ও বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়েছে, আপনাপন শিল্পজ্ঞানকে প্রয়োগ করেছে।

এখানে সেই প্রসঙ্গ আপাতত আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা পুতুল-নাচের প্রত্যেক শ্রেণীর নাচিয়ে পুতুলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা প্রথমে করে নিয়ে, পরে তাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক পরিচয় উপস্থিত করবো।

৩.

ঃ সাধারণ আলোচনা ঃ

আমরা এখানে বিভাগ-উত্তর খণ্ডিত বঙ্গদেশের মধ্যে কেবল পশ্চিম-ভূখণ্ডের, যা পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত, তারই বিভিন্ন অংশে আজও প্রচলিত ও সজীব এবং লোকরঞ্জক পুতুলনাচগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করবো। কিন্তু আমাদের আলোচ্য ভূখণ্ডের পূর্বভাগ যা বর্তমানে 'স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে পরিচিত, সেখানকার এই বিষয়ের সংস্কার সম্বন্ধে এখানে কিছুই আলোচনা করা হয়নি। কেন না সেখানে এই ধরণের কোন নাচ আছে কি না সে সম্বন্ধে সরজমিনে ও সুবিস্তৃতভাবে কোন অনুসন্ধান করার অবকাশ পাওয়া যায় নি।

পূর্বোক্ত তিন প্রকারের পুতুলনাচকে পর্যবেক্ষণ করে বলা হয়েছে : 'পুতুলনাচ প্রকৃত লোকনৃত্য কি না, এই বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন, বিশেষত বাংলাদেশের, প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথীর দুই তীরে যে পুতুলনাচ সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে পুতুল থাকিলেও নৃত্য নাই, বরং পুতুলের অভিনয় আছে।...বাংলাদেশের পুতুলনাচের মধ্যে নাচ প্রাধান্য লাভ করে না, বরং ইহাতে কতকগুলি পুতুলের সহায়তায় একটি যাত্রার অভিনয় হইয়া থাকে মাত্র। যাত্রার মধ্যে নৃত্যের যতটুকু স্থান ইহাদের মধ্যেও নৃত্যের ততটুকু স্থান, ইহাদের মধ্যে নৃত্যের তাহার বেশী স্থান নাই।'[১]

এই মন্তব্যে অনেকখানি সত্য রয়েছে। কিন্তু বিদগ্ধ লোক-সংস্কৃতিবিদ্ উক্ত মতামত দেওয়া বা সিদ্ধান্ত টানার সময় সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের ডাণ্ডের পুতুল [Rod Puppet] এবং সুতোয় টানা পুতুল [String Puppet or Marionette]-এর কথাই মনে রেখেছিলেন। কিন্তু দস্তানা পুতুলের [Glove Puppet] কথাকে আলোচনায় গ্রহণ করেন নি। এ-রকম

হওয়ার কারণ এই যে, যাঁরাই পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচ নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের অধিকাংশই: ১ দস্তানা পুতুলের প্রচলনের সংবাদ বিশেষ রাখেন না। ২. যাঁরা এর সংবাদ রাখেন তাঁরাও আবার এই শ্রেণীর পুতুলকে 'পুতুলনাচের পুতুল' [Puppet] বলতে চান না। খাঁদা মেয়ে যেমন পাত্রপক্ষের অবহেলা সহ্য করে চিরকাল আইবুড়োই থেকে যায়, এও তেমনি 'খেঁদি পুতুল' আখ্যা পেয়ে রসিকজনের শুভদৃষ্টি লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রায় অপরিচয়ের অন্ধকারে রয়ে গেছে। ৩ বিজ্ঞানসম্মত ক্ষেত্র-গবেষণার অভাবে দস্তানা পুতুলের হারিয়ে যাওয়া পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ রূপটিকে আজও পুনর্গঠিত করা যায় নি। সে যাই হোক, পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা যখন প্রত্যেক প্রকারের পুতুলনাচ নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করবো তখন উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে।

পূর্বেই দেখা গেছে যে, কেউ কেউ পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচকে নৃত্য বলতে চান না, তাঁরা বলে থাকেন: 'বাংলার পুতুলনাচ প্রকৃতপক্ষে নৃত্য নয়, অভিনয় মাত্র, ইহাকে লোকনাট্য বলা যত সঙ্গত, লোকনৃত্য বলা তত সঙ্গত হয় না। তবে বাংলাদেশে নাট্যের সঙ্গে নৃত্য বহুকাল যাবৎ সম্পর্কযুক্ত হইয়া আছে। সেই সূত্রেই যতখানি নৃত্য পুতুনাচের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, কেবলমাত্র ততখানি নৃত্যই ইহাতে আছে তদতিরিক্ত কিছুই নাই'।[2] এই বক্তব্য যথার্থই বটে। আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে পুতুলনাচের ইতিকথা প্রসঙ্গে পুতুলনাটকের জন্মবৃত্তান্ত অনুসন্ধান করেছি। গানকে মুখ্য করে ছোটছোট সংলাপের মাধ্যমেই পুতুল-নাটক অভিনীত হত—যাকে আজকের চেহারা থেকে আন্দাজ করা খুবই কঠিন। তাই যেহেতু: ১. এই অপেরাধর্মী 'পুতুলনাট' প্রাচীনকাল থেকেই 'নাচ' নামে অভিহিত হয়ে আসছে তাই এ-পুতুল নাটক হলেও 'পুতুলনাচ' নামে পরিচিত হতে পারে। ২. "সংস্কৃতে নৃৎ ধাতুর মোটামুটি মানে নাচা। এই অর্থে ধাতুটির ব্যবহার ঋগ্‌বেদে এক-আধ বার আছে। 'অভিনয় করা' অর্থ পরে এসেছে।

আসলে নৃৎ মৌলিক ধাতু নয়, 'নৃ' শব্দ থেকে উৎপন্ন, প্রত্যনামধাতু বলতে পারি।"[৩] ৩ এ-ছাড়াও নাচ বলতে অভিধানে কেবল নৃত্য বা dance-কেই বোঝাচ্ছে না, সেখানে বলা হচ্ছে, "নাচ [অকর্মক বাঙলা ধাতু] অভিনয় করান। 'বহু নাচাইলে আমায়' : চৈতন্যচরিতামৃত [বঙ্গবাসী সংস্করণ]"।[৪] তাই এখানে আমরা পুতুল নাচ অর্থে dance এর সঙ্গে dramatic play-কেও সহজে গ্রহণ করতে পারি। ৪ অধিকন্তু দস্তানা পুতুল তো বটেই, সুতোয় টানা পুতুল বা ডাঙের পুতুলগুলি কেবল নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে অভিনয়ই করে যায় না, সুতো ঝুলিয়ে বা টেনে নাচিয়ে নাচিয়ে অভিনেয় নাটকটিকে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করে থাকে। ৫ পুতুলের দ্বারা অভিনয় করানোর সময় মণিবন্ধে [সুতোয় টানা ও দস্তানা পুতুলের ক্ষেত্রে] এবং পায়ে ঘুঙুর বেঁধে সমগ্র অভিনয়ের সময় জুড়েই নাচের তাল সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। আমরা এই গ্রন্থে ডাঙের পুতুলের নৃত্য ও অভিনয়কারীর একটি আলোকচিত্র দিয়েছি। তা থেকে দেখা যাবে যে পুতুল নাচিয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচ করছে। অতএব একে পুতুলনাচ বলা একান্ত ভাবেই অসঙ্গত হয়েছে এমন মনে করি না।

কোন কোন প্রাজ্ঞ সমালোচক পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচকে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা-যুক্ত বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে : 'পশ্চিমবাংলার পুতুলনাচের সঙ্গে লোকজীবনের যে একেবারেই কোন সম্পর্ক নাই তাহাও নহে। কারণ এই কৃত্রিম নৃত্য এবং অভিনয়ানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া যে কাহিনীগুলি রূপায়িত করা হইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকটিই লৌকিক রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ এবং অন্যান্য ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়াই রচিত হয়। বাংলাদেশে রামায়ণ মহাভারত-পুরাণের যে সকল কাহিনী বাঙ্গালীর জীবন এবং বাংলার জলবায়ুর মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাঙ্গীকৃত হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র তাহাই পুতুলনাচের বিষয়। বাংলার জীবন বহির্ভূত, কাল্পনিক কিংবা রোমান্টিক কোন বিষয় ইহার উপজীব্য নহে।'[৫] এই গুণ-বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও উক্ত সমালোচকের মতে পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচে লৌকিক বাদ্যযন্ত্র, যেমন, ধামসা

বা ঢোল বা সানাই ব্যবহৃত না হয়ে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বিদেশীয় বাদ্যযন্ত্র যেমন, হারমোনিয়াম, বেহালা, ক্লেরিওনেট ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং 'লোকজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বিচার করিলে ·····বাংলার পুতুলনাচের লোক-জীবনের সঙ্গে তত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই, তথাপি বিষয়বস্তুর দিক দিয়া বিচার করিলে ইহার সঙ্গে কতকটা যোগ অনুভব করা যাইবে'।[৬]

পরে আমরা পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচের ফর্ম বা প্রয়োগের দিক নিয়ে প্রত্যেক শ্রেণীর পুতুলের পরিচয় দেবার সময় বিশদভাবে আলোচনার মাধ্যমে দেখাবার চেষ্টা করবো যে এই নাচ লোকসংস্কৃতির ধারার সঙ্গে কতখানি যুক্ত অথবা নয়। এখানে কেবল এইটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে উক্ত শ্রদ্ধেয় সমালোচক বাংলার পুতুলনাচের ক অতিসাম্প্রতিক দীনহীন চেহারা দেখে এবং খ. কেবল সুতোয় টানা পুতুলের অনুষ্ঠান দেখে ঐ মন্তব্য দুটি করে থাকতে পারেন। যদিও উক্ত সমালোচক মহোদয় বাংলার পুতুলনাচকে তার বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে লোকসংস্কৃতির অঙ্গীভূত বলতে চান। আমরা আরও একটু এগিয়ে এই নাচের দর্শকদের কথাও এখানে উল্লেখ করতে চাই। বিষয়বস্তু ও তার ভোক্তা দুই-এ মিলিয়ে লোকসংস্কৃতির যে বাতাবরণ সৃষ্টি করে তাকেই বা বাতিল করি কোন যুক্তিতে! ডাণ্ডের এবং দস্তানা পুতুলের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ঢোল ও কাঁসি এবং ঢোলক ও জুড়ি আবশ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়।

এই পরিচ্ছেদের আলোচনার শেষে আমরা আরও কয়েকটি বিষয় আলোচনা করে নিতে চাই। সেগুলি এই রকম:

কোন কোন সমালোচক পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচের পুতুলগুলিকে ঠিক পুতুল বলতে চান না। তাঁদের মতে: 'বাংলার পুতুলনাচে পুতুলও নাই, নাচও নাই। কারণ পুতুল বলিতে আমরা প্রকৃত যাহা বুঝি তাহা পূর্ণাবয়ব কাষ্ঠমূর্তি নহে, পুতুলের সঙ্গে শিশুর খেলেনার ভাবটি জড়িত হইয়া আছে। বাংলাদেশে যে বৃহদাকৃতি মূর্তিগুলি নির্মিত হয়; তাহাদের সঙ্গে খেলেনার ভাবটি কিছুতেই যুক্ত হইতে পারে না, আর নৃত্য······বাংলার পুতুল নাচে

মুখ্য স্থান গ্রহণ করে না…ছোটনাগপুরের পুতুল নাচের পুতুলগুলি শিশুর খেলেনার মত নরম তুলতুলে নেকড়া দিয়া তৈরি, সুতরাং ইহারা প্রকৃতই পুতুল এবং ইহাদের আচরণের মধ্য দিয়া যে রূপটি প্রকাশ পায়, তাহা প্রকৃতই নৃত্য, আনুপূর্বিক নৃত্যগুণের ভিতর দিয়াই এক একটি ক্ষুদ্র কাহিনী ইহাদের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হয়, সুতরাং ইহাই প্রকৃত পুতুলনাচ। ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে বাংলার পুতুলনাচকে এই সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত করা যায় না'।[৭]

প্রত্যক্ষত ছোটনাগপুরের পুতুলনাচ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা বিশেষ ন্যূন। তাই তার গুণাগুণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন মন্তব্য করা সঙ্গত নয়। কিন্তু সমালোচক এখানে পশ্চিমবঙ্গে পুতুলনাচে পুতুল নেই বলে যা বলেছেন তার মূল লক্ষ্য প্রধানত দক্ষিণবঙ্গে প্রচলিত 'ডাঙের পুতুল' [Rod Puppet], তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কারণ তার পরেই তাঁর আলোচনায় নদীয়া জেলার সুতায় টানা পুতুল [Srting Puppet] সম্পর্কে অনুকূল মতামত প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মনে হয় এই ধারণার মধ্যে অনেকখানি অব্যাপ্তি রয়েছে, কেননা :

ক পুতুলনাচের পুতুলকে যে শিশুর খেলার পুতুলের আকারেই হতে হবে এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম কোথাও প্রযুক্ত হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবয়বের পুতুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

খ এ-ছাড়া আগেই বলেছি যে পুতুল নাচের উৎসক্ষেত্রে 'যাদু-প্রক্রিয়া'র ভূমিকা অনেকখানি। ফলে, এ-ব্যাপারে সুদূর অতীতে মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে ভাবে ও যে পদ্ধতিতে অনুপ্রাণিত করেছিল সে বা, পৃথিবীর সেই অংশের মানুষ সেই ভাবেই তাঁদের পুতুল নির্মাণ করে নিয়েছেন। ফলে শিশুক্রীড়ার অবোধ আয়োজন নয়, যাদুশক্তির প্রয়োজনই মুখ্য হয়ে পুতুলগুলিকে অবয়ব দান করেছে।

গ. পুতুল অর্থে 'প্রতিমূর্তি'। এবং এই প্রতিমূর্তি দেব-দৈত্য নর-পশুর। তাই কোন কোন 'লোক' [folk]-এরা পুতুলনাচের পুতুল তৈরি করতে গিয়ে

যথার্থত প্রতিমূর্তিই নির্মাণ করেছেন। এবং এর জন্যে তাঁদের পুতুলকে পুতুল-নাচের পুতুল বলা যাবে না এমন মনে করি না।

উক্ত বিদগ্ধ সমালোচকের বিবেচনায় পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচের, বিশেষত ডাঙের পুতুলগুলি যথার্থ নাচিয়ে পুতুল না হওয়ার পেছনে যুক্তির বিপক্ষে আমার সম্বলব্ধ একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

বিগত ৮. ৪. ১৯৮৭ থেকে ১০. ৪. ১৯৮৭ পর্যন্ত নতুন দিল্লীর Central Institute of Educational Technology-র অন্তর্গত National Council of Educational Research and Training সংস্থা 'শিক্ষায় পুতুলনাচের ব্যবহারের উপযোগিতা' বিষয়ে একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে আমি আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। আলোচনা প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করি যে, সব পুতুলই [Dolls] নাচিয়ে পুতুল [Puppets] হতে পারে না। তার উত্তরে পুতুলনৃত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত জনৈক বিশিষ্ট শিল্পী বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন যে, 'Dolls are different from puppets but dolls can be made into puppets'—অধিকন্তু শুধু পুতুল কেন যে কোন বস্তুকেই তিনি puppet হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন এবং তা-দিয়ে তিনি puppetry-র উদ্দেশ্যও সফল করে তুলতে পারেন। এই কথা বলেই তিনি সেখানে উপস্থিত এক ভদ্রমহিলার একটি এবং নিজের একটি—দুটি জুতো সংগ্রহ করে নিলেন। তারপর তাদের এমন অপূর্ব হস্ত-কৌশলের সঙ্গে নাচাতে লাগলেন যে, কোন দর্শকেরই বুঝতে অসুবিধা হলো না, বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মহিলাকে একটি পুরুষ কিভাবে বিরক্ত [tease] করছে। অনেকভাবে প্রতিবাদের পর শেষে সেই মেয়েটি বাধ্য হয়ে পুরুষটিকে চড় কষিয়ে দিলো।

কোন সংলাপ নয় কোন বাদ্যযন্ত্র নয়, কোন দৃশ্যপটও নয়; কেবল হস্ত-কৌশলের দ্বারা উক্ত শিল্পী মাত্র দু-পাটি চপ্পলের সাহায্যে একটি ছোট্ট অভিনয় দেখিয়ে দিলেন। আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম যে Doll বা puppet ব্যতিরেকেই

কিভাবে একটি সুন্দর puppetry বা পুতুলনাচ উপস্থিত করা যায়

১. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাঙলার লোকনৃত্য' [১৯৮২ : ২য় খণ্ড] : পৃ ৯০।

২. ঐ ঐ : পৃ. ৯০-১।

৩. ড. সুকুমার সেন : 'নট-নাট্য-নাটক' [১৯৬৫] : পৃ. ১৩।

৪. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'।

৫. দ্র. ১নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ৯১।

৬. ঐ।

৭. ঐ : পৃ. ৯৫।

ঃ বিভিন্ন শ্রেণীর পুতুলনাচ ঃ

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা যে আলোচনা রেখে এসেছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে মোট তিন ধরণের পুতুলনাচ আজও প্রচলিত আছে। এই শ্রেণীর পুতুলনাচ তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে এবং আপন আপন বৈশিষ্ট্যে এমনই স্বকীয় যে প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আমরা এখানে তাই প্রতিটি শ্রেণীর পুতুলনাচ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করবো। এখন আমাদের প্রথম আলোচ্য হবে ডাঙের বা দণ্ড পুতুল বা Rod Puppet

ক. ডাঙের বা দণ্ড পুতুল ঃ

মূলত দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশের কয়েকটি থানার অন্তর্গত কিছু গ্রাম এই শ্রেণীর পুতুলনাচের জন্মস্থান ও প্রতিষ্ঠাভূমি; যেমন জয়নগর-মজিলপুর, ডায়মণ্ডহারবার, ফলতা, বিষ্ণুপুর ইত্যাদি। এ-ছাড়াও পশ্চিম-বঙ্গের অন্য দু-একটি জেলায় অতি বিক্ষিপ্তভাবে, প্রায় স্বতোপ্রণোদিত চেষ্টায় [ঐতিহ্যহীনভাবে বলাই বোধ হয় যথোপযুক্ত] দু-একটি দল গজিয়ে উঠেছে। যেমন, বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানার 'স্বপনপুরী পুতুলনাট্য সমাজ', কিংবা মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার মাস্‌লা গ্রামের মদনমোহন নন্দীর পুতুলনাচের দল ইত্যাদি। কিন্তু ডাঙের পুতুলের প্রকৃত যে ঐতিহ্য তা ঐ দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণাতেই মোটামুটিভাবে সীমাবদ্ধ। এই সব অঞ্চলে আজও নেই নেই করে অনেকগুলি পুতুলনাচের দল নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজেদের অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রেখেছেন। এঁরা বর্ষাকালের কয়েকটা মাস বাদ দিয়ে প্রায় সারা বছরই গ্রামে-গঞ্জের বিভিন্ন উপলক্ষ-কেন্দ্রিক মেলায়, উৎসবে, বারোয়ারী পূজা-মণ্ডপে বা সাধারণভাবে আসর সাজিয়ে [প্রায় সর্বত্রেই দর্শনী বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে] ডাঙের পুতুলনাচ দেখিয়ে থাকেন।

এই পুতুলনাচ যাঁরা দেখান তাঁরা নিজের নিজের অঞ্চলে এক একটি দল তৈরি করে নেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দলের প্রধান ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়েছে। আবার কোন কোন দল অন্য কোন পছন্দ মতো নামও দিয়ে থাকেন। যেমন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ডায়মণ্ড হারবার থানার খাগড়াকোনা গ্রামের জগদীশচন্দ্র হালদার তাঁর দলের নামকরণ করেছেন তাঁর পিতার নামে: 'যদুনাথ হালদার পুতুলনাচ অপেরা।' আবার, ঐ জেলারই বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত রসপুঞ্জি গ্রামের প্রয়াত নিশিকান্ত পুরকাইত-এর দলের নাম 'সরস্বতী পুতুলনাট্য-সমাজ'। এই দলগুলি প্রায় সবাই পেশাদার। তবে কিছু শৌখিন দলও এই টি ভি., সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদির শক্তিশালী আক্রমণের মুখেও আজো যে তৈরি হচ্ছে না, এমন নয়। তবে তাদের সংখ্যা যেমন নগণ্য, তেমনি আয়ুও খুবই কম।

এক একটি পুতুলনাচের দলে সাধারণত দশ-বার জন শিল্পী ও কর্মী থাকেন। একজন দলের অধিকারী বা মূল মালিক এবং একজন ম্যানেজার। কোন কোন দলে আবার দলের মালিক এবং ম্যানেজার পৃথক না হয়ে একই ব্যক্তি দুটি কাজই পরিচালনা করে থাকেন। দলে পুতুলনাচিয়ে বা 'প্লেয়ার' [.Player] থাকেন চার-পাঁচ জন এবং তবলা বা ঢোল, কাঁসি, করতাল, হারমোনিয়াম ও ফ্লুট-বাদক এই রকম চার-পাঁচ জন সঙ্গীতশিল্পী এবং দু-এক জন রান্নাবাড়া, জলতোলা ইত্যাদি কায়িক শ্রমের জন্য কর্মী। এই কর্মীদের পালা চলবার সময় দেখা যায় 'শিফটারে'র কাজও করতে। দলে ম্যানেজারের কাজ খুবই দায়িত্বপূর্ণ। এই ব্যক্তিই একাধারে গায়ক, সঙ্গীত-শিক্ষক ও গান রচয়িতা। এই কাজ যিনি করেন তিনি 'মাষ্টার' নামে পরিচিত। যে দলের সঙ্গতি আছে, সেই দল অনেক সময় মাষ্টার ও ম্যানেজার হিসাবে পৃথক পৃথক ব্যক্তিকে নিয়োগ করে থাকে। আবার এমনও দেখা গেছে যে দলের বাইরের কোন পেশাদার সঙ্গীত-শিল্পীকে দিয়ে গান লিখিয়ে বা সুর দিয়ে নিয়ে এসে পালায় ব্যবহার করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে ঐ দলে হয়তো আর

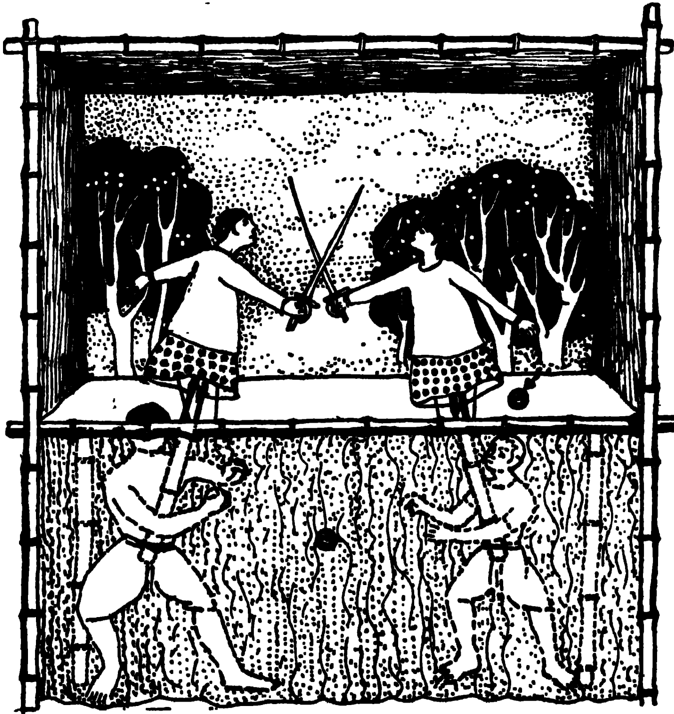
কোন ম্যানেজারের প্রয়োজন হচ্ছে না।

যাঁরা পুতুল নাচান তাঁরাই পুতুলের চরিত্রানুযায়ী নারী বা পুরুষ কণ্ঠে অভিনয়ের সংলাপ বলে থাকেন। এ-বিষয়ে এক একজন এমন অদ্ভুত দক্ষতায় পুরুষ-নারী-যুবক ও বৃদ্ধের ভূমিকায় একই সঙ্গে আলাদা আলাদা কণ্ঠস্বর প্রক্ষেপ করেন যে তা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এরই মধ্যে এমন অনেক দল আছে যাঁদের নিজস্ব কোন বাজনদার নেই, ভিন্ন গ্রাম বা দল বা গ্রামীণ-যাত্রার পার্টি থেকে যন্ত্রশিল্পী [অনেক সময় কণ্ঠশিল্পীও] ভাড়া করে নিয়ে আসতে হয়। যে-সব শিল্পী, কর্মী বা মজুর দলে থাকেন তাঁরা খোরাকি ও ধূমপান ছাড়া পাঁচ-দশ টাকা থেকে কুড়ি-পঁচিশ টাকা পর্যন্ত মজুরী পেয়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গে বলা ভালো যে, উক্ত শিল্পীরা মূলত কৃষিজীবী হলেও অবস্থা-বৈগুণ্যে আজকাল এঁদের বিভিন্ন ধরণের বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছে—যেমন, কেউ ঘরামী, কেউ বা ভূমিহীন ক্ষেত-মজুর, কেউ বা কলে-কারখানায় বা অফিসেও কাজ করে থাকেন।

ডাঙের পুতুলনাচে যে পালাগুলি অভিনীত হয় তার বিষয়বস্তু সাধারণত ঐতিহাসিক-সামাজিক অথবা পৌরাণিক। তবে গ্রামাঞ্চলে এবং গ্রাম্য-মেলাপ্রাঙ্গণে এখনও পৌরাণিক পালারই আদর বেশি। চিৎপুর থেকে প্রকাশিত যাত্রাভিনয়ের বই কিনে নিয়ে এসে, নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাট-ছাঁট করে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই দলের বা দর্শক-শ্রোতার রসবোধ-রুচি ও চাহিদা মতো নিজেরাই একাধিক গান বেঁধে নিয়ে একটি দু-আড়াই ঘণ্টার পালা তৈরি করে পুতুল-নাচের ব্যবস্থা করে থাকেন। প্রত্যেকটি দলে এক বা একাধিক সখি-পুতুল থাকে যারা পালার মাঝে বা সূচনায় উপস্থিত হয়ে হালকা গানের সঙ্গে নাচ দেখিয়ে, কখনও বা dramatic relief-এর, কখনও বা শুধু হাল্‌কা বিনোদনের ব্যবস্থা করে থাকে।

এই পুতুলনাচের অভিনয়-স্থানের [বা মঞ্চ ব্যবস্থার] গড়ন একটু বিচিত্র ধরণের। এখানে যাত্রা এবং থিয়েটারের মিশ্ররূপ প্রযুক্ত হয়ে থাকে। যেমন তিন দিক ঘেরা একটি মঞ্চ বা যেখানে পুতুলগুলি নাচানো হবে সেই

জায়গাটি তৈরি করা হয়। ত্রিমাত্রিক এই মঞ্চের দৈর্ঘ্য কম পক্ষে পনের ফুট হয়, আর একটু বেশি হলেও ক্ষতি নেই। উচ্চতা বা প্রস্থ ন্যূনাধিক বার ফুট এবং গভীরতা কম করে দশ ফুট হওয়ার দরকার। এ না-হলে পুতুল নাচিয়েরা স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতে পারেন না। বাজনদাররাও ঐ ঘেরা জায়গার মধ্যেই একপাশে বসবার ব্যবস্থা করে নিয়ে থাকেন। এরপর যে দিকটিতে দর্শক বসেন অর্থাৎ মঞ্চের সম্মুখভাগে মানুষ-সমান অর্থাৎ অন্তত ছ-ফুট উঁচু একটি অস্বচ্ছ আবরণ ঝুলিয়ে দেওয়া হয় যাতে দর্শকেরা তাঁদের সামনে যাঁরা পুতুল নাচাচ্ছেন সেই শিল্পীকর্মীদের দেখতে না পেয়ে, কেবল



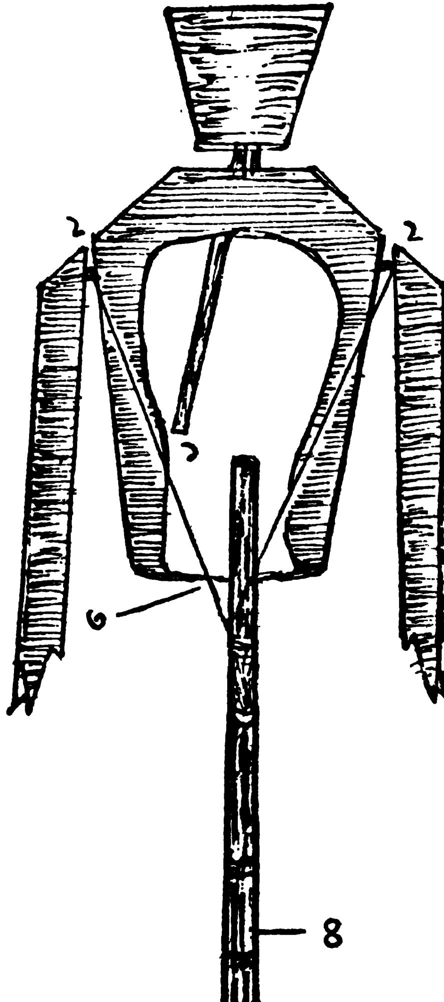
কি ভাবে ডাঙের পুতুল নাচানো হয়

পুতুলগুলির নৃত্য ও অভিনয়ই দেখতে পান।

অভিনয়ের জন্য ঘেরা জায়গায় কোন পাটাতন তৈরি করা হয় না, পুতুল নাচান যে শিল্পীরা তাঁরা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে মাটির ওপর দিয়েই পুতুলগুলিকে নিয়ে এধার থেকে ওধার ঘোরাঘুরি করে পুতুলনাচ দেখিয়ে থাকেন। ঐ ঘেরা অভিনয়ের স্থানের যেটাকে আমরা মঞ্চ বলতে চেয়েছি তার পেছনের দেওয়ালে রাজপ্রাসাদ-বাগানবাড়ী-অরণ্য ইত্যাদির পরিবর্তন সাপেক্ষ একাধিক অথবা একটা অনড় চিত্রিত পট [Scene] দলের সামর্থ্যানুযায়ী ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দু-পাশে দুই বা চারটি 'উইংস'ও [Wings] কারো কারো মঞ্চে টানানো থাকতে দেখা যায়। দর্শকেরা অধিকাংশ আসরে থিয়েটারের মতো মঞ্চটিকে সামনে রেখে অনেক দূর পর্যন্ত পিছিয়ে ও ডান বা বামের অংশ দখল করে মাটিতেই সতরঞ্চি বা চট বিছিয়ে বসে পড়েন। মাথার ওপর প্রায় সব ক্ষেত্রেই আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহৃত হয় উন্মুক্ত তারা-ভরা খোলা আকাশ,—যদিও মঞ্চটির মাথায় ত্রিপল বা চটের আচ্ছাদন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ডাঙের পুতুলগুলি কাঠের তৈরি। হালকা অথচ সস্তা যে কাঠ হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই দিয়ে একটু স্থূল শিল্পকলায় পুতুলগুলি তৈরি হলেও টানা টানা চোখ, টিকালো নাক এবং পৌরাণিক চরিত্রানুযায়ী রঙ ব্যবহারে মুখমণ্ডলটি যে বেশ সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে থাকে, সে কথা স্বীকার করতেই হয়। এদের পোষাক যাত্রাদলেরই মতো। মূল পুতুলগুলির প্রত্যেকটিই দুই থেকে আড়াই ফুট লম্বা [২১ পৃষ্ঠার রেখাচিত্র দ্রষ্টব্য]। পুতুলের মুণ্ড এবং হাতদুটি তার দেহের সঙ্গে শিথিল ভাবে [রেখাচিত্রে ২নং] লাগান থাকে, মুণ্ডটি কাঠের একটি গজালের সঙ্গে এমন ভাবে আঁটা থাকে যাতে সেটি গর্দানের ভেতরের একটি গর্তের মধ্য দিয়ে ঢুকে পিঠের ফাঁকা অংশে বেরিয়ে আসতে পারে [রেখাচিত্রে ১নং]। হাতদুটি কাঁধের কাছে জোড়া অংশে বাঁধা দু-টুকরো দড়ি নিচের দিকে ঝুলে থাকে, যাতে সেটি ধরে টানলে হাত দুটিকে ইচ্ছামতো ওঠানো-নামানো করা যায়। [রেখা-

চিত্রে ৩নং]। আর কাঠের গজালটি ধরে ডাইনে বাঁয়ে ঘোরালে মুণ্ডটিও নড়তে থাকে। প্রসঙ্গত বলা ভালো যে, উক্ত কৌশলের সবটাই পুতুলের



একটি ডাণ্ডের পুতুলের রেখাচিত্র

পোষাকের নিচে চাপা থাকে, যাতে দর্শকেরা কিছুই বুঝতে না পারে। যিনি পুতুল নাচান, তিনি দড়ি দিয়ে বাঁধা ছ-ইঞ্চি মাপের একটা বাঁশের চোঙ [socket] কোমরে বেঁধে নেন। ঐ চোঙের মধ্যে আড়াই-তিন ফুটের মতো লম্বা সরু অথচ শক্ত লাঠি বা ডাণ্ড প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়, যার অপর দিকটি পুতুলের পেটের নিচে তৈরি করে রাখা একটা গর্তের মধ্যে আটকানো থাকে [রেখাচিত্রে ৪নং]। এইবার বাঁশের ঐ লাঠির মাথায় আটকানো পুতুলটাকে পুতুল-নাচিয়েরা নিজেদের মাথা ছাড়িয়ে তুলে ধরে নাচানোর কাজ করতে থাকেন।

আমরা আগেই বলে এসেছি যে, বটতলার ছাপানো বই-এর কাহিনীই এই পুতুল-নাচের অভিনয়ের বিষয়বস্তুর জোগানদার। তাই 'বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর', 'রাজা হরিশ্চন্দ্র', 'সীতার বনবাস' ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনী, 'নাচমহল', 'কেদার রায়', 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি ঐতিহাসিক পালা অথবা 'চাষার ছেলে', 'রূপকুমার', 'রক্তস্বাক্ষর', 'সতী কেন কাঁদে' ইত্যাদি সামাজিক পালা পুতুলগুলির মাধ্যমে অভিনীত হয়ে থাকে। এ-ও বলা হয়েছে যে, কাহিনী বা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পরিবর্জন, পরিবর্তন ও পরিগ্রহণের ব্যাপারটিতে প্রতি দলই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা গ্রহণ করে থাকেন। অন্য-সৃষ্ট মূল কাহিনীর দেহে এই স্বাধীন অপারেশনের কাজটি প্রধানত দলের 'মাষ্টার'-ই করে থাকেন। নতুন গান সংযোজনের ক্ষেত্রে উক্ত মাষ্টারের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও প্রতিভাই সাধ্যানুসারে কিছু করবার চেষ্টা করে। এখানে ডাণ্ডের পুতুলনাচে ব্যবহৃত সেইরকম তিনটি গান উদ্ধৃত হলো :

১. ওঠো ওঠো প্রাণনাথ গো,
তোমার অন্ন তোইয়ার হলো।
তোইয়ার হলো গো তোমার অন্ন
তোইয়ার হলো ॥
ওঠো ওঠো…॥ ১ ॥

নিদ্রা ভেঙে ওঠো প্রাণনাথ,
তোমার সাধের জীবন গেলো।
ওগো, আমি স্বর্ণের থালে
ভাত বেড়েছি,
রূপোর বাটিতে ব্যঞ্জন গো,
তোমার জন্য বসে থেকে
কত রাইত হলো ॥
ওঠো ওঠো…॥ ২ ॥…

লোহার বাসর ঘরে বেহুলার কাছে ক্ষুধার্ত লক্ষীন্দর ভাত খেতে চেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এরপরে সাপের কামড়ে লক্ষীন্দরের মৃত্যু হলে সেই অভুক্ত অথচ মৃত স্বামীকে উপলক্ষ করে বেহুলার কান্নার সময় এই গানটি গাওয়া হয়। এখানে গানটি অসম্পূর্ণ ভাবেই সংগৃহীত হয়েছে।

২ আয়রে ভাই, ও ভাই কানাই
যাই গোচারণে।
আমরা যাই গোচারণে ॥
গোরু ছেড়ে বনে বনে
খেলবো কপাটি,
কত চোখ টেপাটেপি,
বিপিনেতে বিনোদ খেলা
খেলবো ভাই তোর সনে।
আয়রে ভাই যাই গোচারণে ॥…

বাল্মীকি মুনির তপোবনে নির্বাসিতা সীতার দুই পুত্র লব এবং কুশের গান এটি। এই গানটিও আংশিকভাবে সংগৃহীত। লক্ষণীয় যে লবকুশের এই গানের মধ্যে দিয়ে ব্রজের রাখাল কৃষ্ণের গোচারণের গানই গাওয়া হয়েছে।

কৃষ্ণময় বাঙালীর চৈতন্য যে কোন অবস্থাতেই কানু-প্রসঙ্গে গান করে তৃপ্তি পেতে চায়।

৩. দেখ দেখ সহচরী
দেখ লো নয়নভরি.
খেলিছে তোমার হরি,
এসে যমুনায় ॥ ১ ॥
এমন চাঁদের ছবি,
গগনে উদয় রবি,
কাল মেঘ লুকায়ে বেড়ায় ॥
খেলিছে তোমার হরি।
এসে যমুনায় ॥ ২ ॥
সখিরে একি হলো,
বল কোথায় লুকালো,
মোর শ্যাম রায় ॥
না দেখিলে তাহারে,
পরান রাখি কেমন করে
মোর মতো এ-অবলা,
[দেখ] প্রাণে মারা যায় ॥
খেলিছে তোমার হরি
এসে যমুনায় ॥ ৩ ॥

এটি সখি-পুতুল নাচানোর সময় গাওয়া হয়। এখানেও সেই কানুপ্রসঙ্গ। এই গান ও সখি পুতুলের নাচ সাধারণত পালার সূচনায় বা পালার মধ্যে 'রিলিফ' সৃষ্টির জন্য গাওয়া হয়ে থাকে। এই গান তিনটি বিষ্ণুপুর থানার [দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা জেলা] অন্তর্গত রসপুঞ্জি গ্রামের 'সরস্বতী পুতুলনাট্য সমাজে'র শ্রীসুদর্শন পুরকাইতের [২৯] কাছ থেকে সংগৃহীত।

আজও বাঙলার গ্রামে-গঞ্জে, বৈজ্ঞানিক ও সু-উন্নত প্রচার মাধ্যমগুলির

সর্বগ্রাসী আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে যে ভাবে এইসব পুতুলনাচ তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অধিকন্তু এইসব ঐতিহ্যপূর্ণ ও সরল, স্বাভাবিক আনন্দ ও শিক্ষাদানকারী মাধ্যমগুলির মধ্যেকার কোন একটি শক্তি সম্পর্কে সজাগ এবং কৌতূহলী হতেই হয়। এরপরেও বিশিষ্ট ও শ্রদ্ধেয় লোকসংস্কৃতিবিদ্ এদের সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গে যদি এই ধরণের প্রশ্ন তোলেন তবে অবশ্যই কুণ্ঠিত হই। তিনি বলছেন: 'পুতুলনাচ যাত্রাভিনয়েরই একটি সুলভ সংস্করণ মাত্র। যাত্রার দল গঠন করিতে হইলে বিচিত্র আকৃতি ও প্রকৃতির বহুসংখ্যক লোকের প্রয়োজন হয়, তাহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, ইহার অভিনয়ের অনুষ্ঠান করাও সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু পুতুলনাচ তেমন নহে। কেবলমাত্র তিন-চারিজন সুদক্ষ অভিনেতা থাকিলেই কতকগুলি কাষ্ঠনির্মিত পুতুলের সাহায্যেই পুতুলনাচের একটি সুদীর্ঘ পালার অভিনয় করা যাইতে পারে। ইহা যেমন অল্প আয়াসসাধ্য, তেমনই অল্প ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান। সাধারণ পল্লীবাসী গৃহস্থ ইহার ভিতর দিয়া যাত্রাভিনয়ের আস্বাদ লাভ করিতে পারে। লোক-সমাজের মধ্যে জনপ্রিয়তার ইহার এই একটি পরম সুযোগ ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া গেল, যাত্রার জনপ্রিয়তা ইহা দ্বারা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইতে পারিল না। কারণ, যাত্রার যে আবেদন, পুতুলনাচে তাহা প্রকাশ পাইতে পারিল না। যাত্রার মধ্যে কৃত্রিমতা থাকিলেও পুতুলনাচের কৃত্রিমতা যাত্রার আচরণকেও ছাড়াইয়া গেল।

'পুতুলনাচে যে মাত্র তিন-চারিটি চরিত্র অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা নানাভাবে কণ্ঠস্বর, নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিভিন্ন চরিত্রকে বাস্তব রূপ দিবার প্রয়াস পায়। ইহাতে এই অনুষ্ঠানের কৃত্রিমতা আরও বৃদ্ধি পায়, অনেক সময় বিষয়বস্তুর গুরুত্ব রক্ষার পরিবর্তে তাহা হাস্যকর হইয়া উঠে। যাত্রাভিনয়ের মধ্যে তাহা হইবার উপায় নাই; কারণ, ইহাতে প্রত্যেকটি চরিত্রের প্রত্যক্ষভাবে আসিয়া দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আবশ্যক হয় এবং প্রত্যক্ষ আচরণের গুণেই ইহার আবেদন সার্থক হইয়া উঠে'।[১]

এইভাবে তুলনায় আলোচনা স্বভাবতই একদেশদর্শী বিচারের

অপূর্ণতায় ক্লিষ্ট হতে পারে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ। প্রত্যেক মাধ্যমই নিজস্ব রীতিতে নিজেকে প্রক্ষেপ করে থাকে। এই কারণে সবাই সকলের তুলনায় অন্যরকম—নিজের নিজের রকম। তাই উক্ত সমালোচক কথিত ডাণ্ডের পুতুলের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, তার বৈশিষ্ট্য এবং তজ্জাত প্রাণ-শক্তিকে—যা আজও সজীব,—অস্বীকার করি কি প্রকারে ?

খ. সুতোয়টানা পুতুল :

পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত দ্বিতীয় শ্রেণীর পুতুলনাচ 'সুতোয়টানা পুতুলনাচ' [String Puppet বা Marionette] নামে পরিচিত। ঠিক ঠিক বলতে গেলে এই শ্রেণীর পুতুলনাচ আদিতে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ছিলো এমন মনে করা কঠিন। কারণ,

১ বিভাগোত্তর [১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে] নদীয়া জেলার মধ্য ও উত্তর / পূর্বাঞ্চলেই অর্থাৎ বগুলা, মুড়াগাছা, মিলননগর, বড়বেড়িয়া ইত্যাদি উদ্বাস্তু অধ্যুষিত উপনিবেশগুলিতে—যেগুলি আবার হাঁসখালি, কৃষ্ণনগর, তেহট্ট প্রভৃতি থানা বা তার আশেপাশের আরক্ষা-সীমার অন্তর্গত,—প্রধানত এই শ্রেণীর পুতুল-নাচিয়েদের বাস।

২. এই সীমাভূমি দেশ স্বাধীন হবার পরে পূর্ববঙ্গ বা তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু অধ্যুষিত।

৩ এই পুতুল যাঁরা নাচান বা এই শিল্পের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত।

৪ অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে এই শিল্পীরা সকলেই পূর্ববঙ্গ বা অধুনা 'বাঙলাদেশ' রাষ্ট্র থেকে ১৯৪৭ সালের পর ভারত ভূ-খণ্ডে এসে নতুন বসতি গড়ে তুলেছেন এবং নিজেদের সঙ্গে বহন করে এনেছেন ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত তাঁদের শিল্প-সম্পদকে। এখানে যখন নতুন বসতি গড়ে তুলেছেন তখন ঋক্থ হিসাবে বহন করে আনা শিক্ষা-জ্ঞান ও শিল্প-মাধ্যমকে নতুন উদ্যমে এদেশের মাটিতে বপন করে আবার তাতে নতুন নতুন ফুল ফোটাবার চেষ্টা করেছেন।

সব মিলিয়ে দেখা গেছে যে প্রায় শতাধিক সুতোয় টানা পুতুলনাচের দল ঐ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। এঁরা প্রায় সকলেই নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েই এই শিল্পকলাটিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে চলেছেন।

৫ এই প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য পেশ করা যায়। মূল পশ্চিমবঙ্গে সুতোয়টানা পুতুলনাচ একেবারেই অপ্রতুল এবং এখন যাঁরা এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁরা পূর্ববঙ্গাগত হলেও এখানকার কেউ কেউ তাঁদের বেতনভোগী হিসাবে রেখে, নিজেরা সাজ-সরমজাম কিনে দিয়ে ব্যবসাভিত্তিক এক একটি দল খুলে বসেছেন। যেমন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বাটানগরের 'ঘোষ সাউণ্ডে'র মালিক শ্রীশ্যামাপদ ঘোষ নদীয়া জেলার বড়বেড়িয়া কলোনির শিল্পীদের বেতনভোগী হিসাবে রেখে একটি সুতোয়টানা পুতুলনাচের দলের প্রতিষ্ঠা করেছেন। আবার মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার মাধাখালি গ্রামের সুধীরচন্দ্র প্রধান জানাচ্ছেন যে তাঁদের কিছু সুতোয়টানা পুতুল আছে এবং কিছুকাল আগে পর্যন্ত তাঁরা ঐ সুতোয় টানা পুতুল দিয়ে একটা দলও খুলে ফেলেছিলেন। কিন্তু এটা তাঁদের পরম্পরাগত নয়। আজ থেকে বছর পনের আগে একটা দল সেখানে ঐ পুতুলনাচ দেখাতে গিয়ে অভাবের তাড়নায় তাঁদের পুতুলগুলি বিক্রি করে দিয়ে যান। তাঁরা ঐ দলেরই দু-একজনকে শিক্ষক হিসাবে রেখে সুতোয় টানা পুতুলনাচের দল চালাচ্ছিলেন। কিছুকাল নানা জায়গায় তাঁরা অনুষ্ঠান করেও বেড়িয়েছেন। পরে, মূলত অর্থ নৈতিক কারণে তা উঠে যায়।

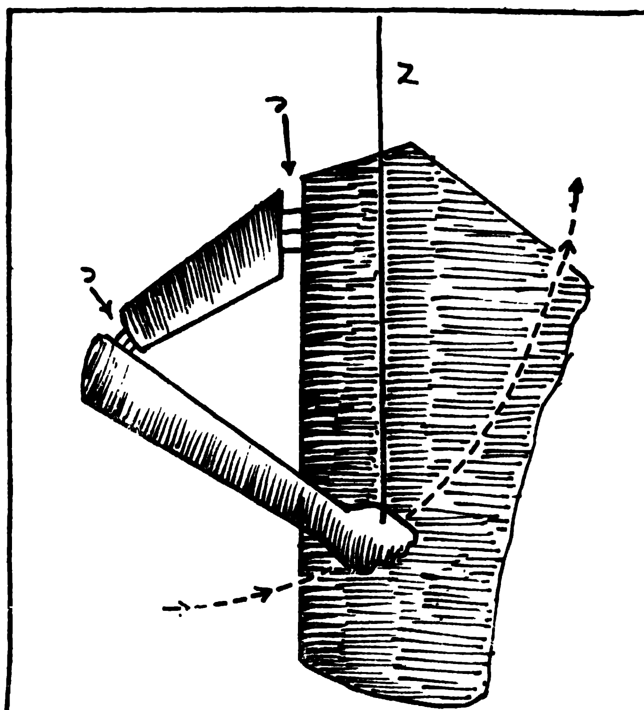
এখানে এই দুটি উদাহরণ দেওয়ার কারণ এই যে, আগে বলে আসা নদীয়া জেলার অঞ্চলগুলির বাইরে যদি কোনও সুতোয় টানাপুতুল নাচের দলের সন্ধান পাওয়া যায় তবে প্রায় ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে, সেখানে এই নাচের ঐতিহ্যগত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমি ছিলো না।

সুতোয়টানা পুতুল-নাচিয়েদের অনেকেরই এইটিই একমাত্র পেশা নয়। পূর্বে ওপার বাঙলায় এঁরা অনেকেই কৃষিজীবী ছিলেন। এখানে এসে, উদ্বাস্তু হিসাবে কলোনিবাসী হয়ে তাঁদের সেই মূল অর্থনৈতিক কেন্দ্রটিকে হারিয়ে

ফেলেছেন।* তাই অনেকেরই অল্প-স্বল্প কিছু জমিজমা থাকলেও অনেকেরই সুনির্দিষ্ট কোন বৃত্তি নেই। কারণ, এই পুতুলনাচ দেখিয়ে বা এর সঙ্গে কোন ভাবে যুক্ত থেকে এঁদের পেট ভরে না, বা দুঃখ ঘোচে না। এঁরা "পশ্চিমবঙ্গ, আসাম বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যার বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জ ও শহরে বছরের প্রায় আট মাস পুতুল নাচিয়ে থাকেন। বর্ষার চার মাস অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত দলের ছুটি। আশ্বিনে বেরিয়ে ফিরে আসতে হয় বৈশাখে। বর্ষা এসে গেলে তার আগেও ফিরতে হয় কখনও কখনও। দল যখন চলে অর্থাৎ বছরে আট মাস দলের সবাই কমবেশি বাঁধা মাইনে পান। খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থাই দল থেকেই করা হয়। দলে বেতনের হার এই রকম—সর্বোচ্চ মাসিক বেতন আটশ এবং সর্বনিম্ন পঞ্চাশ টাকা। সর্বোচ্চ বেতন পান 'মাষ্টার' এবং সর্বনিম্ন বেতন পরিচারকদের। দলের ছুটি হয়ে গেলে প্রায় চার-পাঁচ মাস যাযাবর জীবন থেকে মুক্তি পেলেও একেবারে বেকার। এই সব স্বাভাবশিল্পদের বাড়ীর অবস্থা মোটেও স্বচ্ছল নয়।…এঁদের চাকুরীর কোন নিরপত্তা নেই।"[২]

সুতোয়টানা পুতুল আকারে ছোট—অন্তত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ডাঙের পুতুলের থেকে তো বটেই। এবং রাজস্থানী পুতুলনাচের পুতুলের থেকে কিছু বড়। এগুলি মাথা থেকে কোমর বা তার সামান্য নিচু অংশ পর্যন্ত জমানো শোলা [Spongewood] দিয়ে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের আদর্শে তৈরি করা হয়। মুখমণ্ডলে নাক চোখ-কানের আদল ফুটিয়ে তোলার জন্য মাটির লেই ছেঁড়া ন্যাকড়া ও কাগজের টুকরো ব্যবহৃত হয়। শোভন মুখমণ্ডলে, সুচারুরূপে নির্মিত পোষাকে, দু-আড়াই ফুটের পুতুলগুলি একদিকে যেমন বাস্তব রূপ লাভ করে, অন্যদিকে তেমনি বাঙালীর সৌন্দর্যবোধ এবং জাতীয় রুচি প্রকাশে সহায়তা করে।

পুতুলগুলি দু-হাতের কনুই মুড়তে পারে, কিন্তু ঘাড় সংবদ্ধ [Fixed] বলে কোন দিকেই ঘোরাতে নাড়াতে পারে না [দ্রষ্টব্য 'ক' রেখাচিত্র : ১ সংখ্যা-চিহ্ন]।



রেখাচিত্র ঃ ক

পুতুলগুলির পরণের কাপড় এমনভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় যে এদের পা নেই তা বোঝা যায় না। চার গাছা খুব সরু ও শক্ত কালো সুতোর মধ্যে দুগাছি পুতুলটির দুই কানের পাশ থেকে [দ্রষ্টব্য 'খ' রেখাচিত্র] এবং অপর দু-গাছি সুতো হাতের মণিবন্ধের বা আঙ্গুলের কাছ থেকে উঠে গিয়ে [দ্রষ্টব্য 'ক' রেখাচিত্র ঃ ২ সংখ্যা-চিহ্ন] পুতুল নাচিয়ের হাতে ধরা একটি চার মুখো লাঠির সঙ্গে বাঁধা পড়ে [দ্রষ্টব্য 'গ' রেখাচিত্র]।

সূত্রধর বা পুতুল নাচিয়ে কখনো দু-হাতে একটি, কখনো বা দু-হাতে দুটি- কিংবা তিনটি পুতুল ধরে ঐ কাঠিতে বাঁধা সুতোর সাহায্যে সংলাপ অনুযায়ী বা

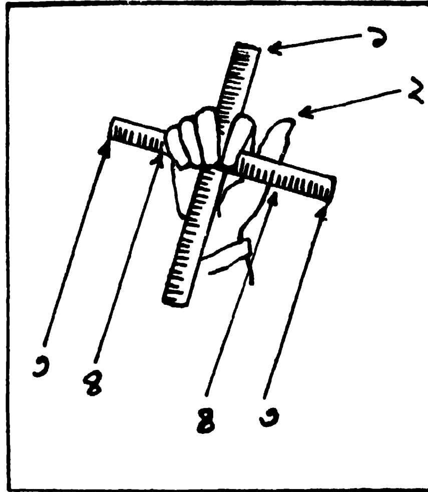
সুরের তালে তালে পুতুলগুলিকে নাচিয়ে থাকেন।



রেখাচিত্র : খ

সুতোয়টানা পুতুলনাচের মঞ্চ নির্মাণেও কিছু বৈচিত্র্য আছে। এখানেও ডাঙের পুতুল নাচের মতো মঞ্চ ত্রিমাত্রিক। প্রায় পাঁচ-সাত ফুট লম্বা, চার-ছ ফুট পর্যন্ত উঁচু এবং তিন ফুট গভীরতা বিশিষ্ট এই মঞ্চের পেছনের পর্দার আড়ালে দুই হাতে ধরা সুতোর সাহায্যে পুতুলগুলিকে মাটি থেকে তিন ফুট উঁচু একটি পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে নাচানো হয়। পাটাতনের নিচের দিক সামনে থেকে অস্বচ্ছ কাপড় দিয়ে এমনভাবে ঢাকা থাকে যে

দর্শকেরা কেবল নৃত্যরত পুতুলগুলি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না। কিছুকাল আগেও মঞ্চের পেছনের অংশে কালো কাপড় ছাড়া আর কিছুই ব্যবহার করা হতো না। আজকাল পরিবর্তন সাপেক্ষ একাধিক ছোট ছোট

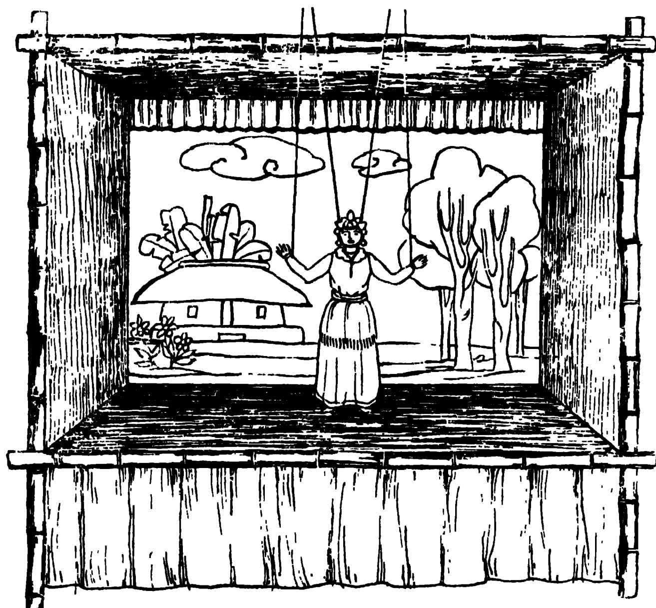


রেখাচিত্র : গ

দৃশ্যপট [Scene] ও দু'পাশে 'উইংস' [Wings] ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দর্শকেরা মঞ্চের সামনে তিন দিক ঘিরে থিয়েটারের মতো করে, কিছু বিছিয়ে মাটিতেই বসে পড়েন, একেবারে পেছনে 'বাবুশ্রেণী'র জন্য কোথাও কোথাও কিছু চেয়ারের ব্যবস্থা থাকে। পুতুলনাচানোর মঞ্চের মাথায় আচ্ছাদন থাকলেও দর্শকদের মাথার ওপর আচ্ছাদন সর্বত্র আবশ্যিক নয়।

সুতোয় টানা পুতুলনাচ সর্বত্রই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উপযুক্ত দর্শনীর বিনিময়ে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এই নাচের অভিনয়ের উপাদান চিৎপুরের ছাপা যাত্রাপালার বই থেকে গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ পালার

কাঠামোটাকে মাত্র রেখে দলের অধিকারী স্বয়ং বা 'মাষ্টার'-এর সহায়তায় জনরুচির দিকে তাকিয়ে বা আপনাপন অভিরুচি অনুযায়ী ঐ সব পালাকে নতুনভাবে গড়ে নিয়ে থাকেন। এ-বিষয়ে ডাঙের পুতুলনাচের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। এখানে গানও ঠিক একই পদ্ধতিতে সংযোজিত বা বর্জিত



রেখাচিত্র ঃ ঘ

কিভাবে সূতোয়টানা পুতুল নাচানো হয়

হয়। ভাঙ্গা-কীর্তন, বৈঠকী, পল্লীগীতি, বাউল অথবা চটুল ফিল্মী গানের সুর অনুসরণ করে এর গানগুলি পরিবেষণ করা হয়ে থাকে। এইভাবে এঁরা 'নটী-বিনোদিনী', 'সাবিত্রী-সত্যবান', 'সাধক রামপ্রসাদ', 'নৌকা-বিলাস', 'ফুলদেবী', 'কাটামুণ্ড', 'অনুসন্ধান', রাজা 'হরিশ্চন্দ্র', 'বেগম আসমান তারা', 'কপালকুণ্ডলা', 'বাবা তারকনাথ', 'ভক্ত প্রহ্লাদ', 'লয়লা-মজনু', 'সোনাই

দীঘি' ইত্যাদি ঐতিহাসিক-পৌরাণিক-সামাজিক পালা দেড়-দুই বা আড়াই ঘণ্টা ধরে অভিনয় করে থাকেন। পালার মধ্যে বিরতি বা নাটক চলতে চলতে মাঝে মাঝে Relief হিসাবে দুটি নারী পুরুষ পুতুলকে উত্তমকুমার-বৈজয়ন্তীমালা-হেমামালিনী বা অতি-সম্প্রতিকালের জনপ্রিয় অভিনেতা মিঠুন-রেখা-শ্রীদেবী-অমিতাভবচ্চন প্রমুখের নামের নাচ দেখাবার বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং দর্শকদের সামনে ঐ বিশেষ নামের পুতুলকে নাচিয়ে পালাকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা বিশেষ কৌতুককর।

সুতোয়টানা পুতুলনাচের প্রতি দলে দশ থেকে বার জন শিল্পী এবং কর্মী থাকেন। এঁদের সকলের মধ্যে 'মাষ্টারে'র দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। ইনি গান

পদ্মতাবলী পুতুল নাচ ক্লাব

॥ এগ্রিমেণ্ট পত্র ॥

[illegible]

নং— সন ১৩৭ সাল, তারিখ—

সাহায্য কারীগণ—		খোরাকি হিসাব—প্রতিসন্ধ্যা
শ্রীযুক্ত [illegible] মাইতি,	[illegible]—	চাউল—
শ্রীযুক্ত [illegible] মাইতি,	মুড়ি—	[illegible]—
শ্রীযুক্ত হিমাংশু প্রধান,	বাতাসা—	তরকারি
শ্রীযুক্ত [illegible] বেরা,	পান—	লঙ্কা—
শ্রীযুক্ত [illegible],	বিড়ি—	পাঁচ ফোড়ন—
শ্রীযুক্ত [illegible],	সিগারেট—	[illegible]—
শ্রীযুক্ত [illegible] মাইতি,	ম্যাচেস—	[illegible]—
[illegible] মাষ্টার.—	চা—	[illegible]—
শ্রীযুক্ত [illegible] ও শ্রীযুক্ত [illegible]	সুপারি—	[illegible]—
[illegible]	চুন—	[illegible]—
শ্রীযুক্ত [illegible]	[illegible]—	সরিষা তৈল—
ম্যানেজার :—	[illegible]—	কেরোসিন তৈল—
শ্রীযুক্ত [illegible] প্রধান	[illegible]—	নারিকেল তৈল—
.ইং ম্যানেজার :—	[illegible]—	[illegible]—
শ্রীযুক্ত [illegible] প্রধান	[illegible]—	গরম মশলা—
গ্রাম—পদ্মতাবলী, পোঃ—[illegible], জেলা—মেদিনীপুর। [illegible]—		পেঁয়াজ
[illegible]	আনাজের খরচ—	
	[illegible]—	[illegible]—
	[illegible]—	[illegible]—
[illegible]—	[illegible]—	[illegible]—

এবং [illegible] দ্রব্য সমূহের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ—[illegible] পুতুল নাচ বন্ধ হইলে খোরাকি দিতে হইবে।

সুতোয় টানা পুতুলনাচের চুক্তিপত্র

বাঁধেন, পালা বলেন, সুর দেন, গান করেন হারমনিয়াম সহ বেশ কয়েক ধরনের বাদ্যযন্ত্রই প্রয়োজনে বাজাতে পারেন। এঁকে গানে সাহায্য করার জন্যে দু-একজন দোয়ারকি থাকেন থাকেন, কর্নেট, ক্লারিওনেট, বেহালা, আড়বাঁশি, বাঁয়া, তবলা, হারমনিয়াম প্রমুখ দলের আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী বাদ্যকরগণ। বাদ্যকর ও কণ্ঠশিল্পীর অবস্থা অনেকক্ষেত্রেই ডাণ্ডের পুতুলের মতো। কেউ বা দলের নিজস্ব ও বেতনভোগী শিল্পী বা কর্মী কেউ বা ঠিকে ;—বিভিন্ন শর্তে অস্থায়ীভাবে দলে নিযুক্ত হয়ে থাকেন।

এ-ছাড়াও প্রতি দলে দু-একজন সাধারণ শ্রমিকও থাকেন যাঁরা একদিকে রান্নাবান্না করা, তাঁবু ওঠানো-ফেলা, টিকিট ঘর সামলানো এবং অবস্থা-বিশেষে ও প্রয়োজনে পুতুল নাচানোর কাজে অল্প-বিস্তর সাহায্যও করে থাকেন।

এই শ্রেণীর পুতুলনাচের দলের কোনটি যৌথ অর্থ-সামর্থ্যে গড়ে ওঠে, আবার কোন দল ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সব রকম ব্যবস্থাপনা, সমস্ত প্রকার দায়দায়িত্ব বহন করবার জন্যে কোন কোন দলে একজন ম্যানেজার থাকেন, কোথাও বা দলের স্বত্বাধিকারীই ম্যানেজারের কাজ করে থাকেন।

এখানে আমরা নদীয়া জেলার বড়বেড়িয়া উদ্বাস্তু কলোনীর অধিবাসী শ্রীকার্তিকচন্দ্র বিশ্বাসের [২৬] কাছ থেকে সংগৃহীত দুটি গান উদ্ধৃত করে দিলাম :

১. ওরে ও সুভাষ বন্ধু রে—এ-এ-এ- —
তোমার লাগি কান্দে পুরুষ মাইয়া,
এসো সুভাষ দেশেতে ফিরিয়া।
সুভাষ বন্ধুরে ॥১॥
সুভাষ বন্ধু রে—এ-এ-এ——
তোমায় যারা দিত সম্মান,
স্বর্গে গেছে ডাক্তার বিধান
দেশবন্ধু গিয়াছে মরিয়া,

সবাই গেছে বাংলা ছেড়ে,
এসো সুভাষ দেশে ফিরে।
বাংলা কান্দে তোমারো লাগিয়া ॥
সুভাষ বন্ধুরে ॥ ২ ॥
ওরে ও সুভাষ বন্ধু রে—এ-এ-এ— —
ভারতেরো ছেলে মেয়ে,
পূজে তোমার ফটো লয়ে,
তোমার ফটো দেখো গো আসিয়া।
দেশে এসো দেশের রাজা,
ভারতবাসী করবে পূজা,
ভারত কান্দে তোমারো লাগিয়া।
সুভাষ বন্ধুরে। ৩ ॥
ওরে ও সুভাষ বন্ধু রে—এ-এ-এ— —
তোমায় যারা দিত সম্মান,
ফরাস আরো চীন জার্মান
অস্ত্র লয়ে আছে গো দাঁড়াইয়া,
দেশে এসো দেশের পাখী
তোমার লাগি ভরে আঁখি
ভারত কান্দে রাজপথে বসিয়া।
সুভাষ বন্ধুরে ॥ ৪ ॥

ভাঙা কীর্তন ও বাউলের সুর মিশিয়ে উদাস সুরে এই গানটি গাওয়া হয়। রিলিফ হিসাবে অথবা পালা আরম্ভের মুখে 'উত্তমকুমার' বা ঐ ধরনের কোন নামের একটি পুতুলকে নাচিয়ে এই গানটি করা হয়। এই গানটি কোন বই থেকে নেওয়া নয়। কোন এক মাষ্টারের লেখা। তবে সুতায় টানা পুতুলনাচের অনেক দলই এই গানটি তাঁদের যে কোন পালা উপস্থিত করবার আগে প্রায় সময়েই গেয়ে থাকেন।

২. ওগো মুনি কি ধন ভিক্ষা দিব।

চেয়ে দেখো ওগো মুনি,
আমার পত্রেরো কুঁড়ে খানি,
ওপরেতে তৃণ নাই গো,
পত্রেরো ছাউনি।
ওগো মুনি…॥ ১ ॥

যখনেতে জন্ম নিলাম রাজা জনকের ঘরে
ষাট সহস্র মুনি এলো কুষ্ঠি লিখিবারে,
কুষ্ঠি লিখে মুনিগণ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস,
এমন সুন্দর কন্যা রাজার দুইবার বনবাস।
ওগো মুনি… ॥ ২ ॥

সবে বলে সীতা সতী,
সীতা পতি পেয়েছে ভালো,
জগবন্ধু স্বামী পেয়ে
আমার কান্‌তে কান্‌তে জনম গেলো,
ওগো মুনি…॥ ৩ ॥

প্রজার নারী সুখে থাকে
তারা পড়ে দামী শাড়ী,
শ্রীরামের গৃহিণী হয়ে
আমি গাছের বাকল পরি।
ওগো মুনি…॥ ৪ ॥

পঞ্চবটী বনে বনবাসকারী সীতাকে অপহরণ করতে রাবণ যোগীর বেশে সীতার কাছে ভিক্ষা চাইতে এলে সীতা এই গানটি করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বাল্মীকি মুনি যখন লব-কুশকে সঙ্গে নিয়ে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে যাবার জন্য সীতার কাছে লব-কুশকে প্রার্থনা জানান, তখনও সীতাকে দিয়ে এই একই গান গাওয়ানো হয়,

কেবল প্রথম স্তবকের পরে নিম্নোক্ত স্তবকটি জুড়ে দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন :

লব-কুশ দুটি পুত্র
আমার দুই-য়ো পাশে থাকে,
রাম শোকে প্রাণ কেঁদে ওঠে
তারা মা মা বলে ডাকে ॥

মুখ্যত এই দুই ধরনের পুতুল নাচ অনুধাবন করে লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ যে উপসংহার টেনেছেন তা এখানেও প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন : 'পুতুলনাচ অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে সূত্রধর কথাটি দেখিতে পাইয়া অনেকে মনে করিয়াছেন যে, পুতুলনাচ হইতেই সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব হইয়াছে। কেহ কেহ এমনও মনে করিয়া থাকেন যে, সংস্কৃত নাটক পুতুলনাচ ব্যতীত আর কিছুই নহে।··· একটি বিষয় হইতে আর একটি বিষয় বিকাশ লাভ করিলে মূল বিষয়ের ধারাটি যে লুপ্ত হইয়া যায়, তাহা নহে ; সেই ধারাটি ক্ষীণ হইয়া গেলেও কোন না কোন ভাবে তাহা সমাজের মধ্যে রক্ষা পায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পুতুলনাচের অস্তিত্ব থাকিলেও এই কথা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, বাংলার নিজস্ব কোন পুতুলনাচ একদিন বিকাশ লাভ করিয়াছিল। বাংলার প্রাচীন সাহিত্য কিংবা শিল্পকীর্তিতে ইহার যে সকল নিদর্শন এখনও উদ্ধার করা যায়, তাহা হইতে ইহা প্রমাণিত হয়।'[৩]

গ· দস্তানা পুতুলনাচ :

বাঙলার নিজস্ব পুতুলনাচ যে একদিন বিকাশলাভ করেছিলো তা পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর পুতুলনাচের পরিচয়কে অতিক্রম করে তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ দস্তানা পুতুলের [Glove Puppet] পরিচয় গ্রহণের মাধ্যমে আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। কিন্তু কি আশ্চর্য পশ্চিমবঙ্গের দস্তানা পুতুলনাচের খবর অনেকেই রাখতেন না। ফলে তাঁরা মন্তব্য করে থাকেন যে এই শ্রেণীর পুতুলনাচ পশ্চিমবঙ্গে নেই। এমন কি যাঁরা তাঁদের গ্রন্থাদিতে বা আলোচনায়

পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন তাঁরা সকলেই এই দস্তানা পুতুলনাচের সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। মাত্র দু-একজন এই শ্রেণীর পুতুল-নাচের বিষয়ে সামান্য যে দু-চার কথা বলেছেন, তাতে তাঁরা এদের 'খেঁদী' বা 'বেণী' পুতুল নামে ডেকে অবজ্ঞা প্রদর্শনই করেছেন।

কিন্তু বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে তা নয়। সরেজমিনে ক্ষেত্রানুসন্ধান করে এই পুতুলনাচ সম্পর্কে অন্যরকম চিত্রই পাওয়া যায়। যেমন : প্রথমত, এ-কথাটা ঠিকই যে পশ্চিমবঙ্গে [সমগ্র বঙ্গদেশ বললেও বোধহয় বিশেষ ভুল হবে না] দস্তানা পুতুল নাচের প্রচলন অত্যন্ত কম।

দ্বিতীয়ত, আজকে যে ভাবে দস্তানা পুতুলের নাচ দেখানো হয়, সেটি একটি প্রাচীন, অত্যন্ত সমৃদ্ধ রূপেরই একেবারে অবক্ষয়িত অবস্থা [এ-বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে]।

তৃতীয়ত, বর্তমানে দস্তানা পুতুল নাচে কোন পালাই ব্যবহার করা হয় না। হালকা কৌতুক রসাত্মক বা সমাজ-সমস্যা নিয়ে রচিত ব্যঙ্গ-মূলক ছোট ছোট গানের সঙ্গে পাঁচ-দশ বড় জোর পনের মিনিট ধরে এই পুতুলনাচ দেখানো হয়ে থাকে।

চতুর্থত, এখন অনেক নয়, মাত্র দুটি পুতুলকে [একটি নারী, একটি পুরুষ] দু -হাতের পাঁচ পাঁচ দশটি আঙুলের সাহায্যে নাচানো হয়।

দস্তানা পুতুলের বর্তমানের এই অবস্থা দেখে কিন্তু আমাদের আগাগোড়াই মনে হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের দস্তানা পুতুলের এই চেহারা চিরকালীন নয়। নিশ্চয়ই কোন এক সময়ে এর একটি সমৃদ্ধতম রূপ ছিলো। বিস্তৃত ও যুক্তি গ্রাহ্য ব্যাখ্যা, সহৃদয় ক্ষেত্রানুসন্ধান এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য-পরিচয় গ্রহণের মধ্যে দিয়ে এই শ্রেণীর পুতুলনাচ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ও উদ্দীপনাময় তথ্যক্ষেত্রে পৌছানো শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে।

মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানা এলাকার পল্লতামলী, ইক্ষুপত্রিকা ইত্যাদি গ্রামে বা এই জেলার আরও কিছু অঞ্চলে কয়েকটি দস্তানা পুতুল-নাচিয়ে আজও কোনক্রমে টিঁকে আছে। এঁরা সকলেই তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ।

এককালে এঁরা রাজা-জমিদারের অথবা সাধারণ যাত্রীবাহী পাল্কী বহন করতেন। কিন্তু আজ বাস-মোটর রিক্সা ইত্যাদি যানবাহনের প্রচলন হওয়ায় সেই সুপ্রাচীন বৃত্তি থেকে এঁরা চ্যুত হয়েছেন। চাষবাস করার তেমন অভ্যাস ছিলো না কোনদিন, যাও বা কারোর কিছু কিছু ছিলো তাও মহাজনের-জোতদারের লোভলোলুপ গহ্বরে চলে যাওয়ায়, এখন প্রায় সকলেই ভূমিহীন সাধারণ মজুরে পরিণত হয়েছেন। অনেকেরই আজ নির্দিষ্ট কোন বৃত্তি নেই, যখন যাঁর যা কিছু জোটে, তাই অবলম্বন করে চরম দারিদ্র্য অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে দিয়ে কায়ক্লেশে দিন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, এই সম্প্রদায়েরই কিছু মানুষ নিতান্ত বিচ্ছিন্নভাবে এবং খুবই অল্প সংখ্যায় বর্ধমান জেলার রসুলপুর গ্রামেও বসবাস করে থাকেন—যাঁদের মধ্যে এই ধরনের কিছু পুতুলনাচ বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত আছে।

এই প্রসঙ্গে আরও কেউ কেউ বলেছেন যে : 'আমাদের বাল্যে ভিন্ন জেলার কিছু নারী পুরুষ গরমকালে ২৪ পরগণার এই ইছামতীর তীর ঘেঁষা অঞ্চলে সাপ ধরার জন্য আসত। কোন দল সাপ খেলার সঙ্গে ছোট কাঠের তৈরী পুতুল আনতো এবং জামার ভিতর হাত ঢুকিয়ে সাপ নাচানোর সঙ্গে পুতুলনাচ শুরু করতো।...বেদেরা নিজেদের থলের ভেতর থেকে দুটি মেয়ে পুতুল বের করে আধুনিক গ্লাভ পাপেটের ঢঙে খোলা আকাশের তলায় নাচানো শুরু করতো।'[৪]

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মূল যে দস্তানা পুতুলনাচ তা কোনভাবেই সাপুড়ে বা বেদেদের উক্ত নৃত্য চর্চার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং কোনদিনও ছিলো না। ঘোর বর্ষায় যখন পাল্কী বহন দুঃসাধ্য হয়ে পড়তো, তখনই উক্ত কাহার সম্প্রদায়ের মানুষজন নিজেদের এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ লোক সাধারণের অবসর বিনোদনের জন্য এই শ্রেণীর পুতুলনাচের আসর বসাতেন। যে হাল্কা অথচ শক্ত কাঠ দিয়ে এঁরা পাল্কী তৈরি করতেন তারই টুকরো দিয়ে দেড়-দু ফুট উচ্চতার এক-একটি পুতুল বানানো হতো। তার ওপর জরি সিল্ক ইত্যাদির

নানা রঙ-বাহারি পোষাক পরিয়ে দেওয়া হতো। পুঁতির মালা, দুল, চুড়ি প্রভৃতি গহনাও তাদের দেহে শোভা পেত। মাটি দিয়ে তৈরি কৃষ্ণনগরের পুতুলের ধরনে সুন্দর মুখমণ্ডলসহ মুণ্ডটি ঐ কাঠের দেহটির সঙ্গে লাগানো থাকে। আঙুলসহ হাতের পাতা দুটিও মাটির তৈরি। পুতুলগুলির ঝুলঝুলে কাপড়ের নিচে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে তর্জনীটি ঘাড়ের নিচে এবং অন্যান্য আঙুলগুলি শরীরের অন্যান্য অংশে চালিয়ে দিয়ে পুতুলগুলি নাচানোর ব্যবস্থা করা হয়।

দস্তানা পুতুলের পালার পাণ্ডুলিপি

আগে রাধা-কৃষ্ণ, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-রাবণ ইত্যাদি বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক চরিত্রানুসারী দশ-বার-চোদ্দটি পুতুল নিয়ে পাঁচ-ছ-জনের একটি নাটকের দল তৈরি হতো। সঙ্গে থাকতো ঢোলক হারমনিয়াম-করতাল আড়বাঁশি ইত্যাদির বাজনদারদের নিয়ে একটি বাদ্যকরের দল। গোল হয়ে বসে, অথবা দাঁড়িয়ে শিব-দুর্গা, রাধা-কৃষ্ণ কিংবা রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি পৌরাণিক বিষয়বস্তু থেকে 'রাধার মানভঞ্জন', 'নৌকা-বিলাস', 'সীতার বিবাহ', 'রাবণবধ', 'শিবের চাষ', 'দুর্গা-গঙ্গার কলহ', 'রাধার কৃষ্ণ-কালী পূজা', 'লবকুশের যুদ্ধ' প্রভৃতি কাহিনী অবলম্বন করে অপেরাধর্মী গীতি-আখ্যান তৈরি করে আধ ঘণ্টা থেকে দেড়-দু-ঘণ্টার অনুষ্ঠান সূচী রচনা করা হতো। এ-ছাড়াও সমাজ-সমস্যামূলক ঘটনা বা লৌকিক প্রেম-কাহিনী নিয়ে এই পুতুলনাচের পালা তৈরি হয়েছে। কখনও বা সমসাময়িক গ্রাম্য ঘটনাকে অবলম্বন করে ব্যঙ্গাত্মক বা কৌতুককর পালাও শোনা গেছে। যেগুলি এক সময়ে সমাজ-শিক্ষক ও সমাজ শাসকের কাজ করেছে।

এই সব পালার গাঁথনদারের কাজ করতেন 'মূল গায়েন'। তিনিই সুর দিতেন গানের, গানে 'লীড' দিতেন—সঙ্গে থাকতো দোহারকি। এঁদের পৌরাণিক জ্ঞান ছিল অসাধারণ, প্রথাগত বিদ্যা খুব একটা না থাকলেও স্বভাব-প্রতিভার বলে এঁরা নাটকীয়তাপূর্ণ, সাহিত্যরসগুণোপেত পালা তৈরি করতেন।

অতীতে এই পুতুলনাচের অনুষ্ঠান কোন পেশাদারী ব্যাপার ছিলো না। শখ মেটানো এবং অবসর বিনোদনই ছিলো এর মূল উদ্দেশ্য। পুতুলের নাচগান দেখে খুশি হয়ে প্রায় সবাই কিছু না কিছু অর্থ-চাল-কাপড় ইত্যাদি পুরস্কার হিসেবে এঁদের দিতেন। পুতুলনাচের সেই সুসময়ে একটু সম্পন্ন গৃহস্থ তাঁদের বাড়ীতে বিবাহ-অন্নপ্রাশন ইত্যাদি শুভ-কাজে পালা গাইবার জন্য এঁদের আমন্ত্রণ জানাতেন। এঁরাও সানন্দে পুতুলনাচের অনুষ্ঠান করতেন, সমাগত অতিথিরা পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করে, পারিশ্রমিক হিসাবে সাধারণত 'সিদে' দিয়ে এঁদের শিল্পকর্মকে সম্মানিত করতেন। কেউ কেউ এর

সঙ্গে কিছু অর্থও দিতেন। আজকাল কিন্তু দস্তানা পুতুলের সেই সৌভাগ্যের দিন গত হয়েছে। একাধিক নয় মাত্র দুটি পুতুলই নাচিয়েদের সম্বল হয়েছে। কোন বাজনদার নেই—কোন পালাও নেই, আধুনিক ফিল্মী ও চটুল সুরে কয়েক মিনিটের হাল্কা বিষয়ের গানের সঙ্গে খুবই ম্যাড় ম্যাড়ে দুটি পুতুল [একটি মেয়ে ও একটি ছেলে পুতুল] নিয়ে নাচ দেখিয়ে থাকেন,—আক্ষরিক অর্থে যাকে ভিক্ষা বলে। বর্ষার কিছু দিন বাদ দিয়ে এঁরা পেটের দায়ে বেরিয়ে পড়েন গ্রাম ছেড়ে, কারণ গ্রামে এই নাচ দেখিয়ে কিছুই মেলে না। কোলকাতা শহরসহ দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এমন কি বাঙলার সীমান্ত পার হয়ে বিহার-উড়িষ্যার সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে ঐ দুটি পুতুল ও দু-চারটি চটুল গান

নমঃ নারায়ণ নমঃ

[illegible] পুতুল নাচ ক্লাব—

★ এগ্রিমেন্ট পত্র ★

নং—   সন ১৩৮ সাল।

দাতার নাম—

সাং—

পোঃ—

বায়নাদারের স্বাক্ষর—

সাং—
পোঃ—
কার্য্যের দিন—

মূল্য—

অগ্রিম—

সুতোয়টানা পুতুলের চুক্তিপত্র

সম্বল করে অন্ন-সংস্থানের উদ্দেশ্যে এঁরা ঘুরে বেড়ান ;—এককালের প্রতিষ্ঠিত ও জাতশিল্পী বা তাঁর বংশধরেরা। এই কারণেই, এই পট-ভূমিকায় আজকের দস্তানা পুতুলের নাচ দেখে, বা তার এই ধ্বংসাবশেষ থেকে, পেছনে ফেলে আসা

গৌরবময় অতীত ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ রূপকে নিখুঁতভাবে খুঁজে বার করা অত্যন্ত কঠিন ও শ্রমসাধ্য কাজ হয়ে পড়ে। ফলে, 'বাঙলায় নিজস্ব কোন পুতুল-নাচ একদিন বিকাশলাভ' করেছিলো বলে কারোরই আজ আর মনে হয় না।

আমরা অনেক অনুসন্ধানে এই শ্রেণীর পুতুলনাচে ব্যবহৃত পালার একটি ছোট পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছি। এখানে তার একটি প্রতিচিত্র ব্যবহার করা হলো [পৃষ্ঠা : ৪০] এবং সেই পাণ্ডুলিপি থেকে তিনটি পালা অংশত উদ্ধৃত হলো:

॥ গঙ্গা ও দুর্গা ॥

দুর্গা—কে গো হরশিরে বিরাজ কর ওলো সুরধুনী।
তখন দেখিয়া ভবানী বলে কেটা লো—
জটার ভিতর যেন লো সাপিনী ॥
গঙ্গা—আমি হর শিরে বিরাজ করি আপনি সুরধুনী
মাগী যেনে কি জান কি, দুর্গা লো,
যত্ন করে রেখেছে শূলপাণি ॥
দুর্গা—ও তোর কোন গুণেতে যত্ন করে রেখেছে শূলপাণি
ও তুই বল দেখি লো শুনি, শুনা গঙ্গা লো—
এমন কথা জানি বা না জানি ॥
গঙ্গা—আমায় শিরে ধরে শূলপাণি পবিত্র হয়েছে।
আমি শুধাই লো তোর কাছে, শুন দুর্গা লো—
তাই ত তিনি মস্তকে রেখেছে ॥
দুর্গা—দেবের দেব মহাদেব কি অপবিত্র ছিল ?
কথাটা শুনে সন্দেহ হলো, শুন গঙ্গা লো—
এমন কথা কে শুনেছে বলো ॥
গঙ্গা—পবিত্র কি অপবিত্র, জানব কেমন করে ?
তিনি রাখবেন কেন শিরে, শুন দুর্গা লো—

জিজ্ঞাসা করে আয় না তোর হবে ॥

দুর্গা—আমি তোর কথাতে জিজ্ঞাসিতে যাব কি সে হবে ?

ছি ছি লাজ বাসে না তোরে শুন গঙ্গা লো—

পোড়ারমুখী দূর হ না এবারে ॥

গঙ্গা—আমি তোর কথাতে এখান থেকে দূর হয়ে কি যাব।

মাগি, বাবুদের তোর গুণের কথা কব, শুন্ দুর্গা লো—

তোর যত গুণ বাবুদের শুনাব ॥

দুর্গা—কি বলবি লো বেটাখাকী তুই আমার গুণের কথা

কেন মর্মে দিলি ব্যথা, শুন গঙ্গা লো—

তোর মত তো খাইনি বেটার মাথা ॥

গঙ্গা—ও তুই বললি হেথা বেটার মাথা খেয়েছিলি কবে ?

আমায় ভজিয়ে দিতে হবে। শুন দুর্গা লো

না হলে ঝাঁটার বাড়ী খাবে ॥

দুর্গা—শান্তনু রাজারে যখন ভাতার ধরেছিলে

তোমরা দুই সতীনে যুক্তি করে, শুন গঙ্গা লো

সাতটা বেটা ডুবায়ে মারলি জলে ॥

গঙ্গা—তার ব্রহ্মশাপে অষ্টবসু জন্ম লওয়ার ছলে।

তারা উদ্ধার হবে বলে, শুন্ দুর্গা লো—

সেইজন্য মরেছে শিশুকালে।

দুর্গা—এমন করে গর্ভে ধরে সন্তানে মেরেছে।

এমন নিষ্ঠুর কেবা আছে, শুন্ গঙ্গা লো—

তোর বা কি গুণ আছে মহীতলে ?

গঙ্গা—আমি বিষ্ণু-পাদোৎভবা গঙ্গা, সর্বলোকে বলে।

তুষ্ট হয় যে আমার জলে শুন দুর্গা লো—

তোর বা কি গুণ আছে ভূমণ্ডলে ॥

দুর্গা—আমি দুর্গতিনাশিনী দুর্গে হই লো পরম সতী।

জীবের ঘুচাই লো দুর্গতি, শুন্ গঙ্গা লো—
তোর মত তো হইনি অসতী।
গঙ্গা—ও তুই অমন সতী কবে হলি বল না সত্য শুনি।
তোর মুখে শেষ তত্ত্ব শুনি, শুন্ দুর্গা লো—
বেটা ভাতার করলি চাঁদ-বদনী ॥
দুর্গা—ছি ছি ছি কার্ত্তিক গণেশ হয় যে আমার ছেলে
ও তুই বললি সবার স্থলে, শুন্ গঙ্গা লো—
এমন কথা বললি কেমন করে?
গঙ্গা—ও তোর পূর্বের কথা বলতে হলো লজ্জা-সরম খেয়ে
যখন হয় না লো তোর বিয়ে, শুন্ দুর্গা লো—
সে সকল কথা যাস না ফাঁকি দিয়ে ॥
দুর্গা—আমি আইবুড়ো কালে বেটা ভাতার করেছিলাম কবে।
আমায় ভজিয়ে দিতে হবে, শুন্ গঙ্গা লো—
তা নাহলে ঝাঁটার বাড়ি খাবে ॥
গঙ্গা—নিরাকার নির্বিকার সত্যযুগে ছিল,
মহাদেব তোর ঘরে জন্মাল, দুর্গা লো—
সেই মহাদেব এখন ভাতার হলো ॥
দুর্গা—তাতে একশত বার দেহপতন করেছিলাম আমি
মিছে দিও না বদনামি, শুন্ গঙ্গা লো—
সেইজন্য হর হলো মোর স্বামী ॥
গঙ্গা—তুই আগে যদি বেটা বলে জানিস মনে মনে
তারে ভজলি কেমনে, শুন্ দুর্গা লো—
পোড়ারমুখী লাজ বাসে না মনে ॥
দুর্গা—ও তুই যা যা যা, গঙ্গ ভাতারি গুমার করিস্ কেন?
ও তোর ধিক্ থাকু জীবন, শুন্ গঙ্গা লো
কালামুখী লাজ বাসে না মনে।

গঙ্গা—দায় পড়ে রতি স্বীকার করেছিলাম বটে।
সে তো একটা ঢেউর চোটে, শুন্ দুর্গা লো—
হস্তীবেটার প্রাণটা গেছে ফেটে ॥
দুর্গা—এতই জীব থাকতে ধনী হস্তীকে নাঙ্গ কর।
ছি ছি লাজ বাসে না তোর শুন্ গঙ্গা লো—
কালার মুখী দেখাবি কাহারে ? ॥
গঙ্গা—ওলো হস্তী যেমন রতিদান আমায় চেয়েছিল।
শেষে মা বলে বলিল, শুন্ দুর্গা লো—
তোর্ কেন বল্ বেটা ভাতার হলো ॥
গঙ্গা, দুর্গা—এইখানে গঙ্গা দুর্গার বিবাদ সাঙ্গ হলো।
তোমরা শুন গো সকল সভাজন গো—
অধিক বিবাদ কেন বল ॥

২.

॥ শ্রীমতী কুসুম তোলতেছিল ॥

শুন সবে পূর্ণ হবে করি নিবেদন।
শ্রীমতীর কুসুম তোলা করি বর্ণন ॥
একদিন সখীর সনে পরমবনে রাধা বিনোদিনী।
কুসুম তোলায় করেছিল ভেটতে চিন্তামণি ॥
প্রবেশে উদ্যানেতে যে যার মতে নানা পুষ্প তুলে।
ডাল ভেঙেছে, ফুল তুলেছে আমারে না বলে ॥
শুনে সেই কথা, মনে ব্যথা লাগিল ভাবিতে।
খাটবে না হে জারিজুরি যাওহে আদালতে ॥
এসেছ দর্প করে যে যার জোরে পুষ্প তুলে নিব।
রাই রাজার প্রজা আমরা কারে না ডরাব ॥
এইরূপ দুইজনাতে সেইখানেতে হয় বাক্য বাণী।

সন্ধান জেনে এলেন তথা কুটিলা পাপিনী ॥
এলেন সন্ধান জেনে নিধুবনে মধুর হাটাহাটি।
ব্যাধ যেন পায়রায় প্রাণে লাগায় আঠাকাঠি ॥
কুটিলা শীঘ্র করি ছুটে গিয়ে কয় আয়ানের কাছে।
ছুটে গিয়ে দেখ দাদা, মান, কুল সব গিয়েছে ॥
তোর বৌ কমলিনী রাজ নন্দিনী মান কি আর আছে ?
কুলের মান ত্যজ্য করে কালা সনে গেছে ॥
আয়ান যান শীঘ্র করি নিধুবনে দেখতে পেলেন কালী।
দুজনাতে পূজতে গেলেন কালি-কমলিনী ॥
ঝুলনা সাজ হলো হরি বল শুন দিয়া মন।
এইখানেতে রাধাকৃষ্ণ আসিল এখন ॥ .....

[অংশত উদ্ধৃত]

৩.

॥ শিব-দুর্গা ঝুলন গান ॥

শুন সবে পূর্ণ হবে করি নিবেদন।
শিব-দুর্গার গাজন গাইব, শুন দিয়া মন ॥
সেই শিব ত্রিসংসারে মান্য করে যতেক দেবতা।
ভক্তি ভরে শুন সবে সেই বিরোধ কথা ॥
তিনি হন পালন কর্তা মুক্তিদাতা দেব-শ্রীনিবাস।
এ সংসারে আসিলেন যিনি করিবারে চাষ ॥
ভীমকে লয়ে সঙ্গে পরম রঙ্গে ভোলা মহেশ্বর।
দ্বাদশ বৎসর শিব না আইল ঘর ॥
গলে তার হাড়ের মালা সিদ্ধিখলা পাগলের গড়া
নিত্য নিত্য যায় বুড়া শিব কুচনীর পাড়া ॥
যত সব কুচের মেয়ে এল ধেয়ে করে হায় হায়।

কোথাকার পাগলা বুড়া দেখলে হাসি পায় ॥
শিব বলে হাসলে কেন ওলো কুচের নারী।
আমারে যে বুড়া বল পীরিত করতে পারি ॥
আমারে দাও না রতি ওগো যুবতী হোক মোর স্থানে।
নতুন পীরিত শিখাইব ভাবনা কর কেনে ॥
তারা কয় হেসে কাছে বসে রঙ্গ দেখে মরি।
তৈল বিনে গায়ের মাংস হয়ে গেছে দড়ি ॥
তুমি কি পীরিত জান এতই কেন কর হে চাতুরী।
ভিক্ষা মেগে খাও তুমি ভোলা-ত্রিপুরারি ॥
এমনি রঙ্গরসে কুচনী বাসে থাকেন ত্রিলোচন।
কৈলাসেতে ভগবতী জানিলেন তখন ॥
পদ্মা কয় ধীরে ধীরে মা তোমারে নিবেদন করি।
শিবের উদ্দেশে চল ওমা শিব শুভঙ্করী ॥
জানিতে বিরোধ তত্ত্ব হল উন্মত্ত গণেশ জননী।
শিবের ধান্য বনে বাঁধ বাঁধিল তখনি ॥
ভয় না করে কারে ত্রিসংসারে কি উৎপত্তি ঘটে।
চড় চড়ানীর কথা শুনে ভীম এলো যে ছুটে ॥
ঝুলনা সাজ হলো হরি বল শুন সভাজন।
তালে বোলে মিলন করে বাজাও এখন ॥

[ভীম ও বাগ্‌তানীর প্রবেশ]

ভীম—কোথাকার ছুঁচ মাগি ও হতভাগী ভাঙলি এসে ধান।
ওরে বেটি সর্বনাশী যাবে রে তোর প্রাণ ॥
দুর্গা—অনেক মৎস্য আছে খেতে ধরতে এলাম তাই।
ভীম—ওরে বেটি বাগ্‌তির মেয়ে তোর মুখে লজ্জা নাই ॥
দুর্গা—আপনার হুকুমে মাছ ধরি যে আপনি।
ভীম—শিব মামা এলে পরে বাঁধবে হাত দু-খানি ॥

দুর্গা—ডাক্ না রে তোর শিব বাবাকে ভয় কি করি তারে !
ভীম—শিব-মামা এলে লম্বা মুখ দেবে চওড়া করে ॥
দুর্গা—আমার মুখ চওড়া কর্বে কি সাধ্য তার আছে !
ভীম—শিব-মামা তোর মত কত মেয়ের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিছে ॥
দুর্গা—ও তোর শিব বাবাকে ডেকে দাও না খলা দিব হাতে।
ভীম—শিব হয় আমার মামা সে কি তোর পারে ভাতার হতে ॥
দুর্গা—ভাতার হয় কি মেসো হয় ডেকে দাও না তারে।
ভীম—শিব-মামা এলে তোমার যৌবন লুটবে পরে ॥
দুর্গা—আমার যৌবন লুটবে শিব কি সাধ্য তার আছে !
ভীম—তোর মত কত মেয়ের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিছে ॥
দুর্গা—ওরে কুচনো পাড়ায় থাকে শিব পাগল তারে জানি।
ভীম—পরের কাজে যেমন তেমন নিজের কাজে মন্দামি ॥
দুর্গা—ফাঁকে দাঁড়িয়ে থাকিস সরে আয়না দেখি।
ভীম—বাগ্‌দির মেয়ে বলে তাইতো জীবন রাখি ॥

রাগ ভরে দুর্গা তখন চড় তুলে যায় ছুটে।
ভয়ে ভীম দৌড়ে পালায় শিবের নিকটে ॥
ভীম গিয়ে সদাশিবে সমাচার জানাল।
ভীমের কথায় সদাশিব দেখতে তখন এল ॥

[শিব ও ভীমের প্রবেশ]

ভীম—মামা, মামা ও মামা, ভাঙ-ধুতুরা খেয়ে চুপ করে বসে আছ। সেদিকে তোমার জমির ধান ভেঙে সর্বনাশ করে দিছে।
শিব—কোথায় কে ধান ভেঙে দিচ্ছে ? তুমি কি বলছ ভীম ?
ভীম—তুমি কি জানতে পারো না ? জানবে কেন ? তোমার কি আর লক্ষ্যই আছে ? বারো বছর ধরে চাষ করে এলাম, তোমার তো খোঁজ নাই। দেখবে চল, মামা দেখবে চল।
শিব—তাই চল ভীম, তাই চল, দেখে আসি।

গীত [শিব-দুর্গা]

শিব—কে তুমি কার কামিনী দাও না পরিচয়।
ধান্য ভেঙে মৎস্য ধর বুকে নাইকো ভয়॥
দুর্গা—বাগ্‌তি জাতির মেয়ে আমি গো নামেতে বাগ্দিনী।
শিব—শিব বলে একা কেন কুলের কামিনী॥
দুর্গা—বুড়ো ভাতার আছে ঘরে গো একা মাছ ধরি।
শিব—কোন দেশে বাড়ি তোমার গো বল না শীঘ্র করি॥
দুর্গা—বঙ্গদেশে বাড়ী আমার গো নিবাস নিশিরপুরে।
শিব—ওগো তোমার পিতা-মাতা কি নাম ধরে বল না সত্য করে॥
দুর্গা—ওগো পিতার নাম হেম দুলে গো, মাতা হেম দুলেনী।
শিব—ওগো তোমার কি নাম, স্বামীর কি নাম বল না গো শুনি॥
দুর্গা—ওগো স্বামীর নাম দিগম্বর জেলে, নাম গৌরী জেলেনী।
শিব—ওগো কয়টি ছেলে গৃহে তোমার বল দেখি শুনি॥
দুর্গা—ওগো কার্ত্তিক গণেশ দুটি ছেলে আছে আমার ঘরে।
শিব—আর কি তোমার কেহ নাই. বল সত্য করে॥
দুর্গা—ওগো আর দুটি মোর কন্যা আছে বড় আদরিনী।
শিব—ওগো কি নাম রেখেছ তাদের বল দেখি শুনি॥
দুর্গা—অতি আদুরে নাম রেখেছি লক্ষ্মী, সরস্বতী।
শিব—ভাল ভাল বিধি আজ জুটাল সন্ততি॥
দুর্গা—ওগো বিধি তোমার কি জুটাল বল সমাচার।
শিব—ওগো নামে নামে নাম মিলেছে সবই হল আমার॥
দুর্গা—কিরূপে সই বল, মুখে লজ্জা নাই।
বাগ্‌দি জাতের মেয়ে আমি পরনারী হই॥
শিব—কোল দাও গো প্রাণ-প্রিয়সী আমার মাথা খাও।
দুর্গা—মদন জ্বালায় জলছ যদি বাড়ি চলে যাও॥
শিব—বাড়ি কেন যাব গা সই অপর কি গো আমি।

দুর্গা—ওগো ও কথা বোলো না তুমি, বেশ্যা নইকো আমি ॥
শিব—ওগো তুমি কার কামিনী একাকিনী দাও না পরিচয়।
ধান্য ভেঙে মৎস্য ধর বুকে নাইকো ভয় ॥
দুর্গা—তোর রূপধন কি যৌবনধন কিছু নাইকো তোর।
বুড়ো ভাতার ধরে কেন তা পাপ করিব ঘোর॥

অংশত উদ্ধৃত]

---

১. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য: 'বাঙলার লোকনৃত্য' [১৯৮২ : ২য় খণ্ড] : পৃ. ৯৩।

২. শ্রীসুশান্ত হালদার: 'নদীয়ার পুতুলনাচের কথা' : 'পশ্চিমবঙ্গ' [৮. ২ ১৯৮০] : পৃ. ৬৫৭।

৩ দ্রষ্টব্য ১ং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ১৬।

৪. কনককান্তি বসু : 'বাঙলা ধারার পুতুলনাচ ও একটি সাক্ষাৎকার : 'সমকালীন' [কার্ত্তিক, ১৩৮৩, ৪ বর্ষ, ৭ সংখ্যা]।

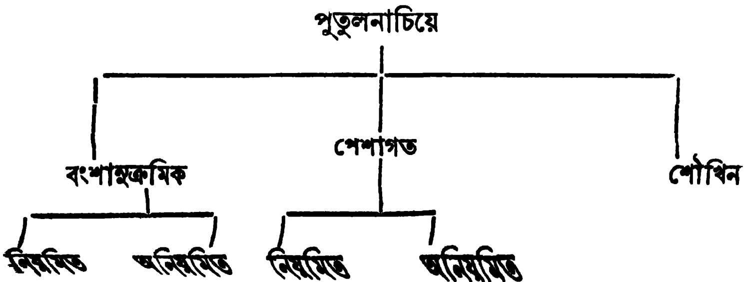


ঃ প্রসঙ্গ ঃ পুতুলনাচিয়ে ঃ

আজ যে-কেউ বলবে, পুতুলের নাচ দেখিয়ে আর পেট ভরে না,—এই কলা মাধ্যমকে একমাত্র আশ্রয় করলে ক্ষুধার তাড়নায় আত্মহত্যা ছাড়া আর পথ থাকবে না, পরিবারের ভরণ-পোষণ তো দূরের কথা। তবুও বাঙলার এই ঐতিহ্য সম্পন্ন লোক-কলা-মাধ্যমকে নানা উপায়ে এর শিল্পীরা, আর বহু-সংখ্যক গ্রাম্য দর্শক কেবল ভালোবাসার জোরে কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখেছেন। পশ্চিম-বাঙলায় প্রচলিত তিন ধরণের পুতুলনাচ বা তার নাচিয়েরা কোন আকর্ষণে বা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কি পেয়ে এই শিল্পকলাটিকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন, আমরা সে সম্পর্কে পৃথক পৃথক আলোচনা করবো। সেই আলোচনা বা অনুসন্ধানের সূত্রে বেরিয়ে আসবে যে, আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় এই শিল্পীদের অবস্থান কোথায় এবং কেমন। বিষয়টি সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহের কাজে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রানুসন্ধানের পদ্ধতিকেই আশ্রয় করা হয়েছে।

পুতুলনাচকে আশ্রয় করে যাঁরা এর সঙ্গে এসে যুক্ত হন, সংযোগের সেই প্রবৃত্তি অনুসারে প্রথমেই তাঁদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায় :

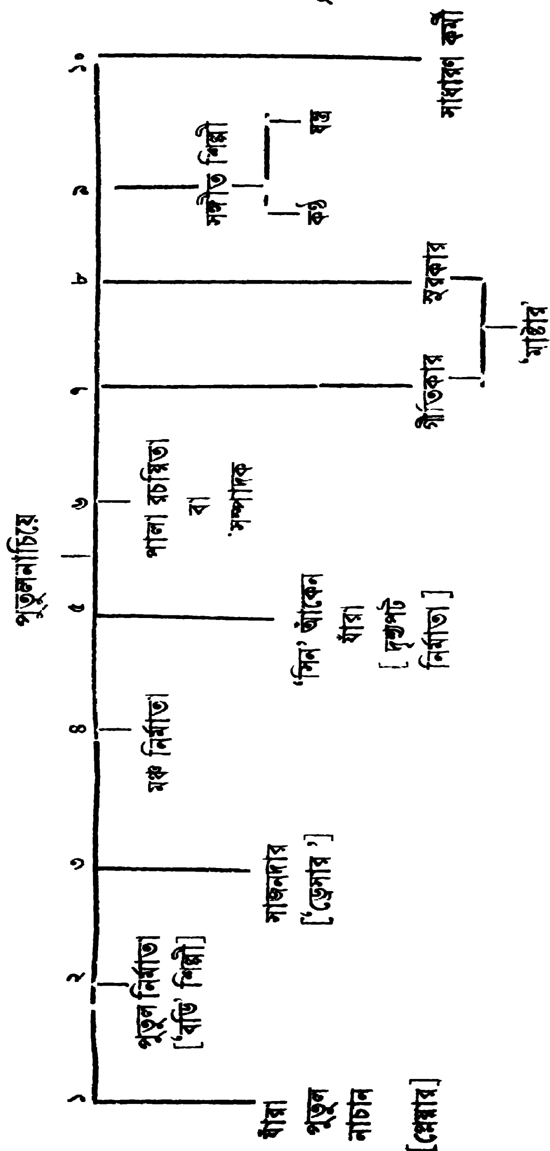
সারণি ঃ ১



আজকের আর্থিক অবস্থা বা সামর্থ্যের এবং সামাজিক পরিবেশের চুলচেরা মানদণ্ড বা অভিজ্ঞান নিয়ে এই কলামাধ্যম সম্পর্কে একান্তভাবে বিচারে বসা ঠিক হবে না ; দীর্ঘকাল ধরে যে ধারা এদের প্রাণরস জুগিয়ে এসেছে তাকে এবং খানিকটা বর্তমান অবস্থাকে পরিপ্রেক্ষিতে রেখে সারণি : ১-টি তৈরি করা হয়েছে। এই সারণি পর্যালোচনার সূচনায় যে কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার তা-হলো যে, তিন প্রকার পুতুল নাচই একটি যৌথ উদ্যোগে বা পরিপূর্ণ ও সার্থক 'টীম ওয়ার্কে'র মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। এই যৌথ উদ্যোগে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় কি? সেটিও একটি সারণির সাহায্যে সুষ্ঠুরূপে বোঝার চেষ্টা করবো [দ্রষ্টব্য : ৫৪ পৃষ্ঠার 'সারণি : ২']।

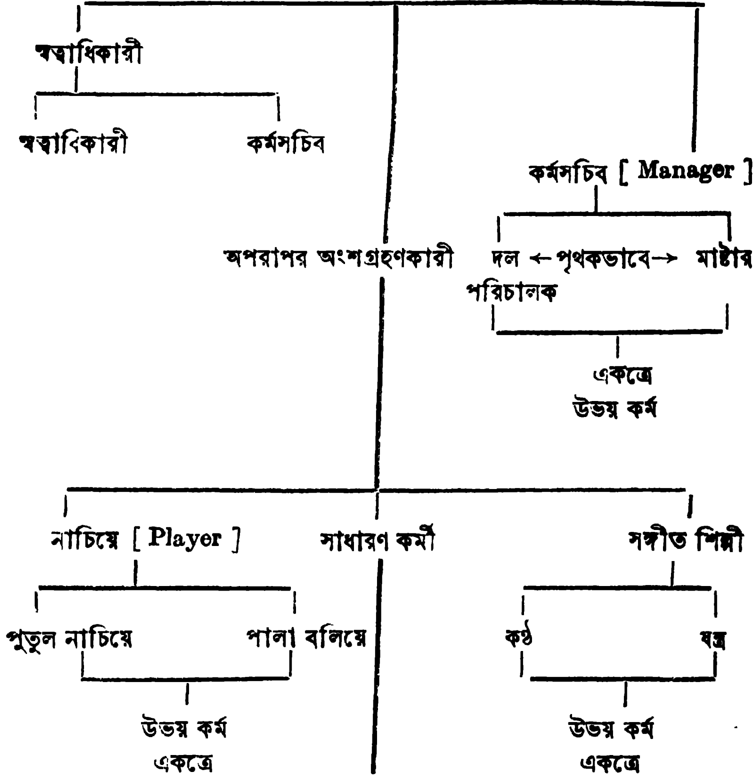
পরবর্তী পৃষ্ঠায় রচিত 'সারণি : ২'-তে একটি পুতুল নাচের দলের যৌথ কর্মধারার যে বিভাজন দেখানো হয়েছে তা কিন্তু কোন দলই সার্থক ভাবে অনুসরণ করতে পারে না। কেন পারে না? সে বিষয়ে অনেকগুলি কারণের উল্লেখ করা যায়,—যার মধ্যে অর্থনৈতিক অসামর্থ্য অন্যতম। যেমন, কোন একটা দলে সর্বক্ষমতাসম্পন্ন একজন প্রযোজক পরিচালক বা স্বত্বাধিকারী যিনি থাকেন, বহু ক্ষেত্রে তিনি নিজেই একজন শিল্পী। দলের মালিক বা স্বত্বাধিকারী হওয়া সত্বেও তিনি শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে বা আর্থিক লাভালাভের হিসাব কষে আলগাভাবে দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না। ফলে, তাঁকেও পুতুলনাচিয়েদের অন্যতম হিসাবে দলে কাজ করে যেতে হয়।

এর পরেও একটি পুতুলনাচের দলের [পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য সারণি ২—অনুযায়ী] অনেক সদস্যকে একাধিক কাজ করে দলের সামগ্রিক ঐক্য বজায় রাখতে হয় এবং সেইভাবেই পালাকে সাকল্যের সঙ্গে প্রদর্শনযোগ্য করে তুলতে হয়। তাই বাস্তব কারণেই সারণি : ২-এর চেহারা অনেক ক্ষেত্রেই বেশ খানিক পরিবর্তিত হয়ে যায়। [সেই পরিবর্তিত চেহারা কেমন, তা ৫৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত সারণি : ৩ অনুসরণে বোঝা যেতে পারে]।



সারণি : ২
পুতুলনাচিয়ে
১ যাঁরা পুতুল নাচান [প্লেয়ার]
২ পুতুল নির্মাতা ['বডি' শিল্পী]
৩ সাজনদার ['ড্রেসার']
৪ মঞ্চ নির্মাতা
৫ 'সিন' আঁকেন যাঁরা [দৃশ্যপট নির্মাতা]
৬ পালা রচয়িতা বা সম্পাদক
৭ গীতিকার
৮ সুরকার
'মাষ্টার'
৯ সঙ্গীত শিল্পী
কণ্ঠ
যন্ত্র
১০ সাধারণ কর্মী

সারণি : ৩



ওপরের সারণি ধরে আলোচনা বা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হবার আগে একটি কথা বিশেষ করে বলা প্রয়োজন যে, বর্তমানে যে অবস্থায় আছে বা কিছু অতীত দিনেও দস্তানা পুতুলনাচ যেভাবে ছিলো সেখানে সারণি দুই বা তিনের মতো

বিভাজন ছক একান্তভাবে প্রযোজ্য নয়। কেন নয় ? —ঐ পদ্ধতির পুতুলনাচের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই।

সারণি : ১ অনুসারে পুতুলনাচিয়েরা কেউ বংশানুক্রমিক ভাবে, কেউ পেশা হিসাবে এই কাজকে গ্রহণ করেন ; কেউ বা শৌখিন ইচ্ছানুসারে নাচের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, তাঁদের সুখ-দুঃখেরও অংশীদার হয়েও যখন ইচ্ছা হয় বা সখ মিটে যায় তখন দল ছেড়ে অন্যত্র বা অন্য বৃত্তিতে নিযুক্ত হন :

কোন পুতুলনাচের দলের স্বত্বাধিকারী নিজে বা তার দলের অপর পুতুল-নাচিয়ে-বাজিয়ে-গাইয়ে অথবা অন্য কোন শাখাভুক্ত কর্মীদের অনেকে বংশানু-ক্রমিক ভাবে পুতুলনাচের কর্মের বা দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। অর্থাৎ তাঁরা জন্মগতভাবে পুতুলনাচানো বা দলচালানো অথবা দলের অন্য কোন কোন নির্দিষ্ট কর্মের ঐতিহ্য রক্তে নিয়েই পৃথিবীর আলো দেখেছেন। এঁদের 'বংশানুক্রমিক'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পিতৃ-পিতামহের রক্তসূত্রে প্রাপ্ত নন—অথচ, অন্তরের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বশে বা বিষয়-রসের টানে কোন এক বা একাধিক শিক্ষকের কাছে শিক্ষা নিয়ে, যাঁরা এই শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং পেশা হিসাবে একে গ্রহণ করে তার দ্বারাই জীবিকা নির্বাহের সাধ্যমতো চেষ্টা করেন তাঁদেরই 'পেশাগত' বলা হয়েছে।

আর যাঁরা তৃতীয়ভাগে রয়েছেন তাঁরা নিজের ইচ্ছায় বা গ্রামের কাকেও পুতুলনাচাতে দেখে বা কারোর অনুরোধে শখ করে পুতুলনাচানোর দলের মধ্যে থেকে কাজ শিখেছেন, তাঁদেরই 'শৌখিন' বলা হয়েছে। এঁরা এই কাজ শখ করে বা ব্যক্তিগত পরিতৃপ্তি পূরণের আনন্দে করলেও যথানিয়মে কিন্তু পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে পারি যে, পুতুলনাচের সঙ্গে যুক্ত সঙ্গীতশিল্পীদের [কণ্ঠ বা যন্ত্র] ক্ষেত্রেও উক্ত প্রকারের বিভাজন এবং সিদ্ধান্ত প্রায় একই ভাবে প্রযুক্ত হতে পারে।

পুতুলনাচের দলে নিযুক্ত ঠিকা শ্রমিকদের সম্বন্ধেও এখানে কিছু বলা দরকার। ঐ সব ঠিকা শ্রমিক বা 'সাধারণ কর্মীরা' প্রধানত দৈনিক রোজ এবং

কদাচিৎ মাস-মাইনের ভিত্তিতে দলগুলিতে কাজ করে থাকেন [এই ব্যবস্থা দলের আর্থিক অবস্থানুযায়ী]। অনেক সময় দলের কোন শিল্পী তাঁর আত্মীয়কে এনে ঐসব সাধারণ কর্মীদলে ভর্তি করিয়ে দেন; তারপর নিজস্ব রুচি বা আগ্রহানুযায়ী ঐ কর্মী পুতুলনাচানোর বা সঙ্গীত শিক্ষার অথবা পার্ট বলার [acting] প্রক্রিয়া শিখে নিয়ে দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। এই কারণেই এই সাধারণ কর্মীদের মধ্যে অনেকেই প্রয়োজনে যেমন গানের আসরে বসতে পারেন, কাউন্টারে বসে টিকিট বিক্রি করতে পারেন, তেমনি পুতুলনাচানোর বা পার্ট বলার কাজও চালিয়ে দিতে পারেন। এই সর্বঙ্করতার গুণ লোকসংস্কৃতির অপরাপর ক্ষেত্রের মতো এখানেও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

আমাদের দেশের লোক-সম্প্রদায় যেহেতু দরিদ্র—সেহেতু অপরাপর অংশের মতোই পুতুলনাচের পরিচালক-শিল্পী এবং অন্যান্যরা অনেকেই দারিদ্র্য-সীমার নীচেই বাস করে। তথাপি, প্রকৃতশিল্পী হিসাবে এঁরা এঁদের অফুরন্ত প্রাণশক্তির জোরে বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পদকে,—তাঁদের ঐতিহ্যকে, আজও বহমান রেখেছেন। এইখানেই বাঙালীর অবিনশ্বরত্ব, এই ক্ষেত্রেই তার পরম্পরাবাহিত সংস্কৃতি মৃত্যুহীন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত তিন ধরণের পুতুলনাচ সম্পর্কে আগের পৃষ্ঠাগুলিতে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত আলোচনা রেখে আসা হয়েছে। এখন প্রত্যেক বিভাগের শিল্পী-কর্মী-স্বত্বাধিকারী প্রমুখের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ঐ শিল্পের আঁতের খবরকে জানার চেষ্টা করা যেতে পারে। এ-বিষয়ে প্রথমেই আমাদের অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ হবে 'ডাঙের পুতুল'কে নিয়ে।

ক. ডাঙের পুতুলনাচ ঃ

যতদূর তথ্য পাওয়া গেছে তাতে এ-কথা বললে বোধহয় ভুল হবে না যে বাঙলায় ডাঙের পুতুলনাচের ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন।—সে-সম্পর্কে গ্রন্থের সূচনায় বিস্তৃত আলোচনা হয়ে গেছে। তবে চার-পাঁচ পুরুষ ধরে ডাঙের পুতুলনাচের দল চালিয়ে আসছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব কম নয়। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশ দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এখনও দেড়-শ / দু-শ বছরের প্রাচীন দলের

সন্ধান যে দু-একটা পাওয়া যাবে না, এমন নয়। এমন যে ডাঙের পুতুলনাচ, তার শিল্পী বা স্বত্বাধিকারীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার যে চিত্র পাওয়া গেছে তা এই রকম :

১. নাম : শ্রীসুদর্শন পুরকাইত।

২. বয়স : ত্রিশ বছর।

৩. পিতা : ৺নিশিকান্ত পুরকাইত। ১৯৮০ সালে মারা যান। ঠাকুরদা ৺প্রিয়নাথ পুরকাইতের কিছু জায়গা-জমি ছিলো। তারই জোরে তিনি একটি পুতুলনাচের দল খোলেন। দলের নাম দেন 'সরস্বতী পুতুলনাট্য সমাজ'। এ-প্রায় আজ থেকে ষাট / সত্তর বছর আগেকার কথা! প্রিয়নাথের পর উত্তরাধিকার সূত্রে দলের মালিক হন নিশিকান্ত এবং নিশিকান্তের পর সুদর্শন। প্রিয়নাথের পুতুলনাচ সম্পর্কে শিক্ষা বা আগ্রহ কিভাবে হয়েছিলো তা সুদর্শন জানেন না। তবে এই জেলায় ডাঙের পুতুলনাচের সুপ্রাচীন একটি ঐতিহ্য ছিলো বা এখনও আছে—সেখান থেকে তিনি হয়তো কোন প্রেরণা পেয়ে থাকতে পারেন।

৪. ঠিকানা : গ্রাম—রসপুঞ্জি-চড়কতলা। মৌজা—দৌলতপুর। থানা—বিষ্ণুপুর। জেলা --দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা। এই গ্রাম ১২নং রসপুঞ্জি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। কোলকাতার বাবুঘাট থেকে ৭৫নং বা বেহালার ১৪নং বাস স্ট্যাণ্ড থেকে L75A বাসে চেপে এই গ্রামে যাওয়া যায়।

৫. শিক্ষা-দীক্ষা ও পারিবারিক প্রসঙ্গ : সুদর্শনের ঠাকুরদার শিক্ষাগত যোগ্যতা কতদূর ছিলো সুদর্শন তা নিশ্চিতভাবে জানেন না। তবে তাঁর কাকা শ্রীসনাতন পুরকাইতের কাছ থেকে জানা গেছে যে তাঁর স্কুল-পাঠশালার পাশ করা বিদ্যা বেশি না থাকলেও রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণাদি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিলো অগাধ। তিনি বাঙলা রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ গড়গড় করে মুখস্থ বলে

যেতে পারতেন। তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিলো সুমিষ্ট নিশিকান্তও বেশিদূর লেখাপড়া শেখেননি—এবং তাঁর পিতা প্রিয়নাথের মতো অতখানি গুণের অধিকারীও ছিলেন না। তবে ছোটবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সহজাত কিছু জ্ঞান ও বিদ্যা আয়ত্ত করেন, যার জোরে তিনি অনেকদিন পর্যন্ত ভালভাবেই পুতুলনাচের দল চালিয়ে এসেছিলেন। নিশিকান্তেরা ছিলেন পাঁচ ভাই। এর মধ্যে একমাত্র নিশিকান্তই আন্তরিক প্রণোদনায় পুতুলনাচকে ভালোবেসে পিতার উত্তরাধিকার সরাসরি গ্রহণ করায় চির-দারিদ্র্যকে বরণ করে নেন। অন্য ভায়েরা বাবা বেঁচে থাকতেই পৃথক হয়ে গিয়ে অন্যতর বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। এখন সবাই কমবেশি প্রতিষ্ঠিত।

সুদর্শন নিজেরা তিন ভাই, চার বোন। বাবা তিন বোনের বিয়ে দিয়ে গেছেন, আর সুদর্শন ছোট বোনের বিয়ে দিয়েছেন কিছুদিন আগে। সুদর্শনের নিজের লেখাপড়া চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। মেজ ভাই স্কুল ফাইনাল পাশ ও বেকার। বাড়ীতেই আশেপাশের পাড়াপড়শির ছেলেমেয়ে পড়িয়ে মাসে ষাট/সত্তর টাকার মতো রোজগার করেন। ছোটজন ষষ্ঠশ্রেণীতে পড়ছে। নিজে বিবাহিত এবং দুই কন্যার জনক। সংসারে বিধবা মা-ই এখন গৃহকর্ত্রী।

৬ পুতুলের সংখ্যা : বর্তমানে পার্টিতে পনেরটি ভালো, অর্থাৎ নাচানোর উপযুক্ত পুতুল আছে; পাঁচটি খারাপ অর্থাৎ ভাঙাচোরা পুতুল। এখন কাঠের যা দাম তাতে শ-দুই তিন টাকা খরচ করতে পারলে পুতুলগুলি আবার ব্যবহারের উপযোগী হতে পারে। সেই আর্থিক সঙ্গতিটুকুও এখন এঁর নেই। আগে দলে আরও পুতুল ছিলো, অভাবে পড়ে নিশিকান্ত অনেকগুলি পুতুল বিক্রি করে দিয়েছিলেন। যতদূর জানা গেছে যে প্রিয়নাথের সময় পঞ্চাশটির মতো পুতুল নাচানো হতো।

৭ পুতুল প্রসঙ্গ : এই পুতুলগুলি মাদার বা যজ্ঞডুমুর গাছের কাঠ থেকে

তৈরি হয়। এই কাঠ অন্য কাঠ থেকে হালকা, অথচ খুবই টঁ্যাকসই। ত্রিশ চল্লিশ বছরের পুরাতন পুতুলও এঁদের কাছে রয়েছে। পুতুলের পোষাক পুরাণো ধুতি-শাড়ী কখনও বা নতুন কাপড় থেকেও তৈরি করে নেওয়া হয়। আর রাজা বা নর্তকী ইত্যাদির পোষাক আমতলা বাজারের 'মিত্র ড্রেস ঘর' থেকে কেনা হয়। এই দোকান সাধারণত কৃষ্ণযাত্রার দলকে পোষাকগুলি ভাড়া দিয়ে থাকেন। সে-সব একটু পুরাতন হয়ে গেলে এঁরা সেখান থেকে বেছে এবং একটু কম দামে প্রয়োজন মতো কিনে নেন। পুঁতির মালা, ধড়া-চূড়া ও অন্যান্য সাজ-পোষাকের উপকরণও এখান থেকে অথবা বড় বাজার থেকে কিনে আনা হয়। সুদর্শন কিছুদিন আগে রাজার দুটি পোষাক পঞ্চাশ টাকায় ঐ দোকান থেকে কিনেছেন। বর্তমানে একটি রাজা-পুতুলকে সব নতুন পোষাকে সাজাতে কমপক্ষে আড়ই শ'তিন-শ টাকা লেগে যায়। এ-ছাড়াও দলের অন্যতম সদস্য শ্রীসুভাষ পুরকাইত, যিনি সম্পর্কে সুদর্শনের কাকা, তিনি প্রয়োজনে পুতুলের সাধারণ পোষাক তৈরি করে নিতে পারেন। নাচের মঞ্চ তৈরির জন্য সুদর্শনের দলে এখন একটি মাত্র 'ব্যাক সীন' ও দুটি 'উইংস্' আছে। অবশ্য মঞ্চের মূল কাঠামো অর্থাৎ বাঁশ—মাথায়-পেছনে-পাশে ত্রিপল এবং সামনের ছ-সাড়ে ছ-ফুট উঁচু আচ্ছাদন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারাই বানিয়ে দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সুদর্শনের দল তো বটেই, সমস্ত ডাঙের পুতুলের দলই প্রধানত 'কল শো'ই করে থাকেন। সুতোয় টানা পুতুলের মতো—সার্কাস পার্টির মতো, তাঁবু টানিয়ে টিকিটের বিনিময়ে সারা দেশ ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠান করে বেড়ান না। ফলে? ফলে সিনেমা-টি. ভি.-ভি.ডি.ও ইত্যাদির সঙ্গে অসহায় ও অ-সম প্রতিযোগিতায় এঁদের ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

৮. দল-পরিচয় : সুদর্শনের দলে কেউ-ই মাসিক বেতনভোগী নয়, সবাই

পালার দিন অনুযায়ী রোজ [দৈনিক মজুরী] পেয়ে থাকেন। কাজের ধরণ অনুসারে পৃথক রোজের হার। যেমন : 'সুর মাষ্টার' হচ্ছেন শ্রীসনাতন পুরকাইত। বয়স পঞ্চান্ন বছর। ইনিও সম্পর্কে সুদর্শনের কাকা হন। এঁর মজুরি রোজ পঁচিশ টাকা। ইনি পালার প্রয়োজনানুসারে গান বাঁধেন, সুর দেন এবং হারমোনিয়াম নিয়ে গানে লীড দেন। সঙ্গে অধিকাংশ সময়েই দু-জন দোহারকি বা সহ-গায়ক থাকেন। এঁদের দল যখন ভালভাবে চলতো পাঁচজন পর্যন্ত সহ গায়ক থাকতেন। বর্তমানে এই দোহারকিদের রোজ পনের থেকে সতের টাকা। সাধারণত দোহারিকদের হাতে কোন না কোন বাদ্যযন্ত্র থাকেই। এ-ছাড়াও দলে যদি একজন ঢোল বাদককে নিতে হয়, তবে তাঁর রোজ আঠারো টাকা। তবলচিরও প্রায় ঐ রকমই। বাইরে থেকে কর্ণেট বা ফ্লুট বাদক ভাড়া করে আনতে হয়, কারণ সুদর্শনের নিজের দলের নিজস্ব ঐ যন্ত্র নেই ;– তাই বাদ্যকরও নেই। এই বাদ্যকরকে রোজ দিতে হয় [গুণগত মান অনুসারে] পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা। সুদর্শন নিজেই পুতুল নাচান। তাঁর আলাদা কোন মজুরি নেই। দল কোন পালা গেয়ে যদি কিছু লাভ করতে পারে তবে তার থেকে দল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু এবং নিজের জন্য কিছু ব্যয় করতে পারেন, নচেৎ নয়। সুদর্শন ছাড়া আরও চারজন player বা পুতুল নাচিয়ে আছেন, তাঁদের রোজ হলো সতের টাকা থেকে কুড়ি টাকা। সাধারণত কোন কোন দলে পুতুলের হয়ে পাঠ বলার [acting করার] কিছু পৃথক শিল্পী থাকেন। সুদর্শনের আর্থিক সঙ্গতি নেই, তাই তাঁরা নিজেরা পুতুল নাচাতে নাচাতেই কখনও নারী—কখনও পুরুষ—কখনও বালক বা বৃদ্ধের কণ্ঠের অনুকরণে পাঠ বলে যান। প্রসঙ্গত এঁর কাছ থেকে জানা গেল যে, চল্লিশ/পঞ্চাশ টাকার রোজে এমন পাঠ বলিয়ে ভাড়া পাওয়া যায়, যাঁরা একই সঙ্গে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে চার-পাঁচ রকমের

কণ্ঠে 'এ্যাকটিং' করে যেতে পারেন।

৯. আর্থিক প্রসঙ্গ : সুদর্শন বর্তমানে একটি পালা করতে দু-আড়াই ঘণ্টা সময় নেন। মজুরি সাধারণত তিন-চার-শ-র বেশি পান না। চা-বিড়ি এবং খুব দূরের রাস্তা হলে গাড়ীভাড়া বায়নাদারেরাই দিয়ে থাকেন। এই দলের একটা বাঁধা আসর আছে, তা হলো বেহালা-বড়িশার চণ্ডীমেলা। মেটিয়াবুরুজ থানার বদরতলার রথের মেলাতেও এঁরা প্রায় নিয়মিত আসর পেয়ে থাকেন। গত ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে এঁরা মোট আটটি আসর পেয়েছিলেন। শিল্পী ও কর্মীদের মজুরি, খাওয়া---গাড়ীভাড়া---চা-বিড়ি ইত্যাদির খরচ-পাতি করে এমন কিছুই থাকে না যাতে অন্তত তাঁর নিজের পরিবার প্রতিপালিত হয়—দলের উন্নতিবিধান তো বহু দূরের কথা। তাই তাঁর দলের কারোরই পুতুলনাচ মূল উপজীবিকা নয়। ফলে সুদর্শন বিড়ি বাঁধে, দেড় কাঠা বাস্তু জমির ওপর যে চারটে নারিকেল গাছ আছে তার ফসল বিক্রি করে, কয়েকটা হাঁস ও ছাগল প্রতিপালন করে। ঠাকুরদার আমলের চাষের জমি সুদর্শনের বাবার আমলেই চলে গেছে।

১০. পালা-পরিচয় : 'সরস্বতী পুতুলনাট্য-সমাজ' বা সুদর্শনের দল পৌরাণিক পালা করতেই ভালবাসে। এবং গ্রামের মানুষ এখনও মোটামুটিভাবে পৌরাণিক পালা দেখতেই একটু বেশি পছন্দ করে। এই দলের চারটি পৌরাণিক পালা অভিনয়ের জন্য এখনই তৈরি আছে। যেমন : রাজা হরিশ্চন্দ্র, রাবণবধ বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর, লব-কুশ। কিছু সামাজিক পালাও এঁরা করে থাকেন। চিৎপুরের যাত্রাপালার বইকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে নিজেদের অভিনয়-সামর্থ্য ও জন-রুচির অনুযায়ী করেগড়ে তোলেন। আধুনিক যাত্রা-পালাগুলিতে গানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেছে। এঁরা সেই অভাব পূরণ করার জন্ত 'সুর-মাষ্টার'কে দিয়ে গান বাঁধিয়ে নেন। অনেক সময়

সিনেমার 'হিট' গানের সুরকে যে-কোন ধরণের পালায় নির্বিচারে ব্যবহার করে থাকেন।

১১. মন্তব্য : সুদর্শনের বাবা নিশিকান্ত যখন বেঁচে ছিলেন তখন ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর 'সঙ্গীত নাটক অ্যাকাদেমি'র 'রবীন্দ্রভবনে'র প্রাঙ্গণে এঁরা দু-দিন পুতুলনাচের অনুষ্ঠান করেছিলেন। ১৯৭৮–'৭৯ খ্রীস্টাব্দে 'লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ'-এর সভাপতি প্রয়াত ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের সুপারিশে এই পুতুলনাচের দলের স্বত্বাধিকারী নিশিকান্ত সহ পাঁচজন শিল্পী উক্ত জাতীয় অ্যাকাদেমীর বৃত্তি ভোগ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত সুদর্শনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে. এই টি. ভি., ভি ডি ও., সিনেমার যুগে তাদের ভবিষ্যৎ কি ? এর উত্তরে তিনি, কিন্তু একেবারে নৈরাশ্য প্রদর্শন করেন নি। উপযুক্ত আর্থিক অনুদান, ঐতিহ্য বজায় রেখে আধুনিকীকরণ, স্থায়ী প্রদর্শনশালা নির্মাণ, যথার্থ দরদী-অভিজ্ঞ ও কলা-রসিকের গঠনমূলক প্রণোদনা লাভ করলে এই কলামাধ্যম অবশ্যই আপনার হৃতগৌরব ফিরে পেতে পারে। এরই অনুষঙ্গে সুদর্শন তাঁর সম্প্রতি লব্ধ একটি অভিজ্ঞতার কথাও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানিয়ে দেন। গত ১৩৯৫ বঙ্গাব্দের ৫ই বৈশাখ বাখরাহাটের [কোলকাতার বাবুঘাট থেকে ৭৫ নং বাস পথে] থেকে কিছু দূরে চালখোলায় সপ্তাহব্যাপী এক মেলা বসেছে। উদ্যোক্তারা সুদর্শনের পার্টিকে দু-দিনের পালার জন্যে ৭২৫ টাকার চুক্তিতে নিয়ে গেছেন। প্রথম দিন সন্ধ্যায় হরিশচন্দ্র পালা আরম্ভ হয়েছে। বেশ জমে উঠেছে। শ-পাঁচেক মানুষ-জন নিবিষ্ট মনে পালা দেখছে, এমন সময় উদ্যোক্তাদের পক্ষে কিছু লোক এসে খানিক ধমকের সুরে বললেন, "এই তোমাদের পালা বন্ধ কর ; এখন ভি. ডি. ও.-তে 'অমর-সঙ্গী' সিনেমা হবে"। [সাক্ষাৎ গ্রহণের তারিখ : মে, ১৯৮৮]।

'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ'—এর সাধারণ সম্পাদক[১] গত ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২৬-২৭ নভেম্বর 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা' উপলক্ষে দিল্লীর প্রগতি ময়দানে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঐতিহ্যবাহিত ডাঙের পুতুল নিয়ে দু-টি অনুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠানের জন্য 'নিউ জ্ঞানদা অপেরা'-কে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই দলের স্বত্বাধিকারী : শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী।

বয়স : সাতান্ন বছর।

ঠিকানা : গ্রাম—খাকড়াকোনা। পোঃ সাধুর হাট। থানা : ডায়মণ্ডহারবার। জেলা : দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।

এই দলের অবস্থা 'সরস্বতী পুতুলনাট্য সমাজ'-এর অপেক্ষা কিছুটা ভালো। সতীশবাবু নিজে এবং তাঁর বড় ছেলে মাধবচন্দ্র [২৫] দুজনেই পুতুল নাচান। এঁর নিজস্ব বাড়ী আছে। ইনি পৌরোহিত্য করেও কিছু উপার্জন করেন। এঁর পুতুল এবং তাদের সাজ-পোষাক ভালো। 'সীন'-'উইংস' এবং পুতুলের সংখ্যাও বেশি। দলের নিজস্ব ঢোল-তবলা-হারমোনিয়াম-করতাল ইত্যাদি কিছু বাদ্যযন্ত্র আছে। প্রয়োজনে ক্ল্যারিওনেট ও ফ্লুট-বাজিয়ে ভাড়া করে আনেন। ইনি বায়নাও কিছু বেশি পেয়ে থাকেন। তবে দলের শিল্পী-কর্মীরা সুদর্শনের দলের চেয়ে খুব একটা বেশি মজুরি পান না। ইনি যে হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে বিলি করেন তাতে : "এ-বছরের সুপারহিট নাটক—পৌরাণিক—'তরণীসেন বধ', 'সতীর দেহত্যাগ,' 'সীতার বনবাস', 'বীর অভিমন্যু', 'সতী তুলসী'। ঐতিহাসিক—'ক্ষুধিত হারেম', 'রক্তাক্ত ময়নামতী', 'জীবন্ত কবর'। সামাজিক—'চণ্ডী-তলার মন্দির', 'অভিশপ্ত ফুলশয্যা', 'মেজদি', 'বধূবরণ', 'সিঁদুর নিও না মুছে'"—ইত্যাদি পালার বিজ্ঞাপন আছে। সতীশবাবুর দলের আর্থিক অবস্থা, শিল্পীদের সঙ্গে দলের সংযোগ-সম্পর্ক সবই সুদর্শনের বা অন্য দলের মতোই। আসলে এই শিল্পের সঙ্গে

১. বর্তমান গ্রন্থকারই হলেন সাধারণ সম্পাদক।

যাঁরাই যুক্ত তাঁদের সকলেরই অবস্থা এক,—কেউ তপ্ত খোলায়, আর কেউ বা জ্বলন্ত উনানে,—উনিশ-বিশ মাত্র। [সাক্ষাৎ গ্রহণের তারিখ : ডিসেম্বর ১৯৮৬]।

খ· সূতোয়টানা পুতুল ঃ

যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রানুসন্ধানে জানা গেছে যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে সুতোয়টানা পুতুলনাচের পরম্পরাগত কোন সংস্কার ['handed down for generation after generation'] নেই। তবুও পেশাদার-অপেশাদার বেশ কিছু পুতুলনাচের দল নদীয়া ছাড়াও বাঁকুড়া—মেদিনীপুর—চব্বিশ পরগণা ইত্যাদি জেলায় বিক্ষিপ্ত এবং না-পরম্পরাগতভাবে গড়ে উঠেছে, যাদের কেউ মৃত, কেউ মুমূর্ষু, কেউ বা সক্রিয়। এখানে বিভিন্ন জেলার তিনটি সুতোয়-টানা পুতুলনাচের দলের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই শ্রেণীর পুতুলনাচের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সামগ্রিক একটি ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

পূর্বের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' অধ্যায়ে আমাদের দেশে পুতুলনাচের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে যে-কথা বলে আসা হয়েছে, সে-কথা মনে রেখেও পারিপার্শ্বিক নানা অবস্থা বিচার করে এমন মন্তব্য করলে বোধহয় ভুল হবে না যে, সমগ্র গৌড়-বঙ্গে সুতোয়টানা পুতুলনাচের প্রচলন ডাঙ্গের পুতুলের মতো অতো দূর অতীতে হয়নি। আর পশ্চিমবঙ্গে তো এই পুতুলনাচিয়েরা 'দেশ ভাগাভাগির পর পূর্ব-পাকিস্তান বা বর্তমানে বাঙলা দেশের খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর ও বরিশাল ছেড়ে এই এলেকায় এসে নয়া বসতি গড়ে তুলেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আগে অবিশ্যি সখের পুতুলনাচের দল গড়ে অনিয়মিতভাবে নাচ দেখিয়ে বেড়াতেন'।[১]

যে সময়েই হোক, এই শিল্প-মাধ্যমের বেঁচে থাকার প্রশ্নে, সমৃদ্ধির সমস্যায় এবং লোকপ্রিয়তার ক্ষেত্রে প্রাণশক্তির যে পরিচয় সমাজের নিচের থাকের শ্রমকারী অথচ শিল্পী মানুষদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে আনা গেছে,

এখানে সেই তথ্যপঞ্জীকে একের পর এক উপস্থিত করা হলো :

এক.

১. নাম : শক্তিপদ প্রামাণিক।

২. বয়স : চল্লিশ বছর।

৩ ঠিকানা : গ্রাম—ভগবানখালি। ডাকঘর—চাকলান। থানা : চণ্ডীপুর। জেলা : মেদিনীপুর।

৪ শিক্ষা-দীক্ষা : শক্তিপদবাবু নিজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছিলেন। কিন্তু পুতুলনাচের নেশায় মত্ত হওয়ায় পড়াশুনা আর এগোয়নি। তাঁর দলেরও অনেকেরই প্রথাগত বিদ্যা কিছু না কিছু আছে। এবং অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তির সংখ্যাও তাঁর দলে যথেষ্ট কম।

৫. পুতুলের সংখ্যা : বর্তমানে শক্তিবাবুর দলে ভালোমন্দ মিশিয়ে মোট পঁয়ত্রিশখানি পুতুল আছে। গোটা চার-পাঁচ সখি ও 'জোকা'র পুতুল আছে। দু-চারটে পুতুল ছাড়া বাকি সব পুতুলকেই ইচ্ছে মতো ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ একটি পৌরাণিক পালায় যে পুতুল লক্ষ্মণের বা রাজা হরিশ্চন্দ্রের পার্ট করলো, সেই পুতুলই সামাজিক পালায় জমিদারবাবু বা ঐতিহাসিক পালায় সিরাজদ্দৌলার অভিনয় করতে পারে। পোষাক পরিবর্তনের দ্বারাই এমনটি করা সম্ভব। তবে রাম বা কৃষ্ণ-এর গায়ের 'নবদূর্বাদলশ্যাম' বর্ণের জন্যে অন্য চরিত্রে তাঁদের নামানো যায় না।

৬. দল-পরিচয় : শক্তিপদবাবুর দলের নাম 'আদ্যাশক্তি পুতুল থিয়েটার'। এই দলের 'অফিসিয়াল' ঠিকানা হলো : নরঘাট, মেদিনীপুর। এই দল শক্তিপদবাবুর নিজে হাতে তৈরি নয়। এমন কি বংশ-পরম্পরাগত ভাবে তৈরি দল চালাচ্ছেন বা এই কলা-মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত আছেন—এমনও নয়। ইনি জানান যে, কোন এক 'নবোদয় সংঘ'-এর কাছ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর

থানার কালিকাখালি গ্রামের লক্ষ্মীকান্ত পাত্র তিন হাজার টাকা দিয়ে সম্পূর্ণ 'এস্টেট' অর্থাৎ পুতুলনাচের সমগ্র উপকরণ কিনে নিয়েছিলেন। কিন্তু বছর পাঁচ-ছয় দল চালানোর পর লক্ষ্মীকান্তবাবু অপারগ হলে, তাঁরই দলের ক্ল্যারিওনেট বাদক নলিনীকান্ত বেরা এক বছর দলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও 'বাসন্তী পুতুল থিয়েটার' বাঁচলো না। তখন ঐ 'এস্টেট' কিনে নিলেন শক্তিপদবাবুর জ্যেঠামশাইয়ের ছেলে। তিনি দলের নাম দেন 'মহামায়া পুতুল থিয়েটার'। ইনি পাঁচ বছর বেশ ভালোভাবেই দল চালিয়েছিলেন। কম-বেশি কিছু লাভও হয়েছিলো। এই সময়ে শক্তিবাবু তাঁর জ্যাঠতুতো ভায়ের দলে মাঝে মাঝে 'এ্যামেচার' হিসাবে যোগ দিতেন। ক্রমে এই বিষয়ে তাঁর আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং শিল্পী-মানসিকতা পুষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু 'মহামায়া পুতুল থিয়েটারে'র এমন সুসময় বেশিদিন থাকে নি। দল তুলে দেবার মনস্থ করলে শক্তিবাবু নিজের জমি বিক্রি করে মাইক, লাইট, পঁয়ত্রিশখানি পুতুল, সীন, উইংস ইত্যাদি সবকিছুই পনের হাজার টাকায় কিনে নেন। সে-প্রায় আজ থেকে আট ন-বছর আগেকার কথা। শক্তিপদবাবু নতুন করে দলকে সাজিয়ে গুছিয়ে, কিছু পুরাতন—কিছু নতুন কর্মী নিয়ে 'আদ্যাশক্তি পুতুল থিয়েটার' নাম দিয়ে নতুন পথে যাত্রা আরম্ভ করে দেন। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা সত্ত্বেও আজও তিনি এই কঠিন পথ চলায় অক্লান্ত।

৭. আর্থিক প্রসঙ্গ : বাজারে কম করেও চার-পাঁচ হাজার টাকা ধার। তবুও অদ্ভুত জেদের বশে শক্তিপদবাবু তাঁর দল চালিয়ে যাচ্ছেন--এখনও হার মানেন নি। পুতুলনাচ তাঁর একমাত্র পেশা নয়,—হলে তাঁকে আর বাঁচতে হতো না, অধিকন্তু সংসারটিও তাঁর বড় নয়, তাই পুতুলনাচের কাজ যখন না থাকে, তখন কোন রকমে এদিক-ওদিক করে দুটো পেটের ভাত—পরণের কাপড়

জোগাড় করে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয় না।

১৩৯৪ বঙ্গাব্দে শক্তিবাবু ১২০ দিন মাত্র [আশ্বিন থেকে বৈশাখের মধ্যে] পালা গেয়েছেন। এর মধ্যে কিছু 'কল শো', আর বাকি সবই তাঁবু খাটিয়ে সার্কাসের মতো দেশ-বিদেশ ঘুরে টিকিটের বিনিময়ে অনুষ্ঠান। শক্তিবাবুকে নিয়ে বর্তমানে দলে বারজন লোক আছেন। এঁরা কেউ-ই স্থায়ী বেতন ভোগী নন। অধিকাংশই দলের সঙ্গে স্থায়ীভাব যুক্ত থাকলেও দিন-মজুরি হিসাবেই এঁরা তাঁদের পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। এই পারিশ্রমিকের হার এই রকম [রোজ হিসাবে] : সুরমাষ্টার যিনি তাঁর মজুরি ত্রিশ টাকা। শক্তিবাবুর দলের এই সুরমাস্টার স্থানীয় বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক—নাম : কৃষ্ণমোহন প্রধান। বয়স পঁয়ত্রিশ। ইনি প্রায় চার বছর শক্তিবাবুর দলে আছেন। যাঁরা পুতুলনাচান তাঁদের 'আর্টিষ্ট' বা 'বাজীগর' বলা হয়। এঁদের রোজ পনের টাকা। যাঁরা বিভিন্ন পুতুলের কণ্ঠে স্বরক্ষেপণ করেন তাঁদের বলা হয় 'এ্যাক্টর' [actor]। শক্তিবাবুর দলে এই রকম দু-জন আছেন। তাঁরা প্রত্যেকে আঠারো টাকা করে মজুরি পেয়ে থাকেন। প্রয়োজনে শক্তিবাবু নিজেও পার্ট বলে থাকেন, পুতুল নাচাতে নাচাতে।

৮. পালা-পরিচয় : সারা বছরে বর্ষার কিছুদিন বাদ দিয়ে শক্তিবাবু বহু জায়গায় ঘুরে বেড়ান। গত ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণার উত্তর এবং দক্ষিণ, বিহার ও উড়িষ্যার বাঙালী-প্রধান এলাকাগুলিতে ইনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। এঁরা সব রকম পালাই অভিনয় করে থাকেন। অর্থাৎ ঐতিহাসিক-সামাজিক-পৌরাণিক। যেমন : 'নটী বিনোদিনী', 'সাবিত্রী-সত্যবান', 'সাধক রামপ্রসাদ', 'ফুলদেবী', 'কাটামুণ্ড', 'বাবা তারকনাথ'। এক-একটি পালা করতে সাধারণত দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় নিয়ে থাকেন। প্রয়োজনে আরও কম বা আরও বেশি সময় নিতে পারেন। অভিনয়ের

প্রয়োজনে পালাগুলির ক্ষেত্রে পরিবর্তন-পরিবর্জন ও পরিমার্জন করা হয়ে থাকে—ডাঙের পুতুলগুলির মতোই। [সাক্ষাৎ গ্রহণের তারিখ : ২৪. ৫. ৮৮]

দুই.

সুতোয়টানা পুতুল সম্পর্কে বাঁকুড়া জেলার একটি দলের কাছ থেকেও কিছু তথ্য এখানে সংগ্রহ করা হয়েছে। কোথায় মেদিনীপুরের দক্ষিণ-অঞ্চল আর কোথায় বাঁকুড়া জেলার উত্তর ভূ-ভাগ। অনেক কিছুতেই দু-জায়গার দূরত্ব অনেক, কিন্তু তফাৎ নেই দুঃখ ভোগে, বঞ্চনায় ও অবহেলায়,—আশ্চর্য নৈকট্য।

* 'স্বপনপুরী পুতুলনাট্য সমাজ'। স্থাপিত : ১৯৭৬।

* স্বত্বাধিকারী : শ্রীস্বপনকুমার ব্যানার্জী। ১৯৭১—মাধ্যমিকে অকৃতকার্য, কিন্তু নজরুলগীতি ও কাব্যগীতিতে সিনিয়র উপাধিপ্রাপ্ত।

* ঠিকানা : বসত—রামপুর, পোঃ হামিরহাটী। জেলা : বাঁকুড়া।

* দলে পুতুল আছে ষাটটি। আর আছে নিজস্ব মাইক। নিজস্ব স্টেজ। দলে বাদ্যযন্ত্রের সংগ্রহ এই রকম : হারমোনিয়াম, বাঁয়া-তবলা, ঢোল, খোল করতাল, জুড়ি, ঘুঙুর, ঝাঁজ, সাইডড্রাম, বিডড্রাম।

* দলের পালা তৈরি আছে—'ভক্ত প্রহ্লাদ', 'মাতুলালয়ে মহাপ্রভু', 'জয় সন্তোষী মা', 'উত্তরা-অভিমন্যু', 'পিতা-পুত্রের যুদ্ধ', 'রামের সুমতি', 'তোতা পাখী', 'অন্যায়-অবিচার', 'সাহেব' ইত্যাদি একচল্লিশটি। অধিকন্তু দলের ছাপানো হ্যাণ্ডবিল জানাচ্ছে : 'পুতুলনাচের প্রত্যেক দিনের নতুন নতুন নাটক হয়। নাটক ছাড়াও সবার প্রিয় জোকারের হাস্য রসিকতা থাকবে। হাঁসতে ভাল লাগে বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতীর হাঁসির খোরাক যোগাতে হন্দোড় কুচকুচের এবং হাড় পামের নানা ধরণের হাঁসির প্রতিযোগিতা।'

স্বপনকুমার নিজে পালা তৈরি করেন। নিজে গান বাঁধেন। নিজেই তাতে সুর দেন। নিজেই গান গেয়ে থাকেন, পাঠও বলে থাকেন। তবুও তাঁর দলে মোট চৌদ্দজন লোক। একজন নানা চরিত্রের অভিনেতা। একজন গাইয়ে। দু-জন পুতুলনাচিয়ে। একজন প্যাণ্ডেল ম্যানেজার। একজন দলের

ম্যানেজার। একজন গানের দোহারকি। একজন জুড়ি বাজিয়ে। দু-জন গেট ম্যান। দু-জন টিকিট বিক্রেতা। একজন রাঁধুনি ও একজন জোগাড়ে। এই হলো সমগ্র 'স্বপনপুরী পুতুল নাট্যসমাজে'র ইউনিট।

* ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে মোট তেরটি তাঁবু ফেলেছেন ইনি। ১৩৯৫, ২৯শে জ্যৈষ্ঠে শেষ তাঁবু ফেলার পর বর্ষার জন্য পালা বন্ধ ছিলো। পূজোর পর ফের কাজ আরম্ভ হবে। তাঁর নাট্যাভিনয়ের টিকিটের হার পঞ্চাশ পয়সা। সাধারণত আশ্বিন মাস থেকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত পালানুষ্ঠান চলে। এই দল 'কল শো' করার ডাক প্রায় পায় না বললেই হয়। তাই দেশ-দেশান্তরে তাঁকে তাঁবু নিয়ে সার্কাস পার্টির মতো ছুটে বেড়াতে হয়।

* কোন জায়গায় তাঁবু পাতলে পঞ্চায়েত পুরসভা, বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদিকে প্রাপ্য কর দিতে হয়। তা-ছাড়াও স্থানীয় মাস্তান ও ক্লাবকে তোলা, পুলিশকে ফিষ্টি করতে কিছু দিতে হয়। তাই শিল্পীদের বেতনসহ ১৩৯৪ সালে ধার হয়েছে চার হাজার টাকা। ফলে স্বপনকুমারের 'অবস্থা খুব কেরসিন।'

* স্বপনকুমারের এই পুতুলনাচ স্পৃহা ঐতিহ্যগত নয়। নিজের সহজাত রস-পিপাসা, যা থেকে এই কলা-শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই দল তিনি খুলেছেন। এটি নতুন কোন দল নয়। নদীয়া জেলা থেকে স্বপনকুমারের অঞ্চলে নাচ দেখাতে আসা একটি দলের পুতুল নাচ দেখে তিনি অনুপ্রাণিত হন এবং নদীয়া জেলারই অন্য একটি দলের কিছু পুতুল ও আনুষঙ্গিক উপকরণ কিনে নিয়ে 'স্বপনপুরী পুতুলনাট্য সমাজে'র পত্তন করেন এবং পরে দলের শ্রী ও সমৃদ্ধি সাধিত হয় তাঁর হাতেই।

* স্বপনবাবু পুতুল-নির্মাণ সম্বন্ধেও কিছু সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন তাঁর এই পুতুল শোলা জমিয়ে তৈরি হয়। একটা ছোট পুতুল তৈরি করতে দশ এবং বড় পুতুলের ক্ষেত্রে প্রায় কুড়ি তাড়ি [বাণ্ডিল] শোলা লাগে। এক তাড়ির দাম দুই / তিন টাকা। জমানো শোলার ওপর কাদার লেই—ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে মুণ্ডুটির আকার দেওয়া হয় এবং পরে তাতে চোখ-মুখ-

নাক-কান-এর আদল ফুটিয়ে তোলা হয়। কব্জি থেকে সমস্ত হাতটা খড়ের ওপর কাপড়ের ঢাকা দিয়ে তৈরি করা হয় [ঠিক যেভাবে পায়ের বালিশ তৈরি হয়]। কাপড়ের টুকরো, কাদার লেই ইত্যাদি দিয়ে হাতের তালু ও আঙুল বানানো হয়।

মুণ্ডু সহ একটি সাধারণ মাপের পুতুলের দৈর্ঘ্য দেড় থেকে দু-ফুট, আর ফুট খানেকের মতো কাপড় ঝুলতে থাকে—অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট আকার নেয় এক-একটি পুতুল।

একটা পুতুলকে রঙ করতে ও চোখ-মুখ আঁকতে [উল্লেখ্য যে একটা পুতুলের মুখমণ্ডল এবং হাতের পাতা ও আঙুল ছাড়া আর সবই নাচ দেখানোর সময় কাপড়ে ঢাকা থাকে] দশ টাকার মতো খরচ পড়ে। একটা রাজার পোষাকের দাম দেড়-শ থেকে আড়াই-শ। রাজা-বাদশার মুকুট আলাদা করে কিনতে হয়। দাম পড়ে প্রায় আড়াই-শ টাকা। একটা সাধারণ পুতুল সাজাতে এক-শ টাকার কমে কিছুতেই হয় না।

শুধুই পুতুলনাচের পুতুল তৈরি করে, বা পুতুল তৈরি একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রধান জীবিকা [যেমন ছৌ-নাচের মুখোশ-তৈরির কারিগর সম্পর্কে বলা যায় ; অবশ্য ছৌ-মুখোশের কারিগর বছরের কয়েকটা মাসই কেবল মুখোশ বানায়—অন্য সময়ে প্রতিমা, ঘরের দরজা-জানালা পাল্কী তৈরি—ইত্যাদি কাঠের কাজ করে থাকেন] এমন কোন কারিগর কোথাও নেই। ছুতার মিস্ত্রি যাঁরা তাঁরাই অর্ডার মতো, অবসর সময়ে, মর্জি অনুসারে এই সব পুতুল তৈরির বা রঙ করার কাজ করে থাকেন। অবশ্য প্রত্যেক দলেই এমন কিছু লোক থাকেন যাঁরা প্রয়োজনে বা আপৎকালে পুতুল তৈরি মেরামত-রঙ করা ইত্যাদির কাজ বেশ ভালোভাবেই করতে পারেন। স্বপনবাবুও নিজেও অনেক সময়, বেশ ভালোভাবেই পুতুলে রঙ করতে পারেন। [সাক্ষাৎ গ্রহণের তারিখ ১৬. ৬. ৮৮]

তিন.

এবার চলে আসি আরও দূরে—নদীয়া জেলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে,—যেখানে

সুতোয় টানা পুতুলের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র, অর্থাৎ হাঁসখালি—রাণাঘাট—নবদ্বীপ—কৃষ্ণনগর—তেহট্ট ইত্যাদি থানার অন্তর্গত মুড়াগাছা—মিলননগর—ভবানীপুর—বড়বেড়িয়া ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলে। অনুসন্ধানে যা দেখা গেছে তাতে এমন মত দেওয়া যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র বিক্ষিপ্তভাবে যে-সব সুতোয়টানা পুতুলনাচের দল আছে সেই সব দল যেমন ঐতিহ্যসূত্রে গড়ে উঠেনি, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির এই উপাদানও নদীয়ায় বহিরাগত। অধিকন্তু, বহিরাগত হয়েও—নদীয়ায় নবীন, এই লোককলা মাধ্যম পশ্চিমবঙ্গের ইতস্তত ছোটবড় দল গড়ে তুলতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে—উপাদান দিয়ে, কলাকুশলী দিয়ে, শিক্ষা [traning] দিয়ে। তাই এখানকার পুতুলনাচের আঁতের খবর নেওয়া দরকার—এবং নিলে দেখা দেখা যাবে যে এরও সার্বিক স্বাস্থ্য ভালো নয়। শাখা কেন্দ্রগুলির মতো মূল কেন্দ্রও মুমূর্ষু।

নদীয়া জেলার সুতোয়টানা পুতুলের সুখ-দুঃখের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত এবং তাঁদের বাঁচাবার ইচ্ছায় 'পশ্চিমবঙ্গ পুতুলনাট্য সংঘ'-এর স্থাপয়িতা-সভাপতি শ্রীসুশান্ত হালদার মশাই এ-সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তা আমাদের জানা তথ্যের থেকে ভিন্নতর তো নয়ই, বরঞ্চ অনেক বিষয়ে আরও শোচনীয়। তিনি লিখছেন: 'নদীয়া জেলার পুতুলনাচ পাড়া বা গ্রাম বলতে বোঝায় নদীয়ার হাঁসখালি থানার মুড়াগাছা কলোনী, মিলননগর, ভবানীপুর, বগুলা ও তার আশে পাশের গ্রাম ‥ একমাত্র এই এলাকাতেই বিচিত্র সুন্দর সুন্দর গ্রামে রয়েছে প্রায় ৫২টি পুতুলনাচের দল। এ-ছাড়া রাণাঘাট থানার বড়বড়িয়া কলোনী, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণগঞ্জ তেহট্ট থানায় আরে ৪৮টি মিলিয়ে সর্বসমেত প্রায় ১০০টি পুতুল নাচের দল রয়েছে এই জেলায়।…এক একটি দল নানান ধরণের কাজের জন্যে ১২ থেকে ১৮ জন শিল্পী ও কর্মী নিয়ে গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও উড়িষ্যার বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জ ও শহরে এই দলগুলো বছরের প্রায় ৮ মাস পুতুল নাচ দেখিয়ে থাকে। …দল যখন চলে অর্থাৎ বছরে প্রায় ৮ মাস দলের সবাই কমবেশি বাঁধা মাস

মাইনে পান। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা দল থেকেই করা হয়। এ বাদে সর্বোচ্চ মাসিক বেতন ৮০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ৫০ টাকা।...দলের ছুটি হয়ে গেলে প্রায় ৪/৫ মাস যাযাবর জীবন থেকে মুক্তি পেলেও একেবারে বেকার। এইসব স্বভাবশিল্পীদের বাড়ীর অবস্থা মোটেও স্বচ্ছল নয়। কারো কারো কিছু জমিজমা আছে। এঁদের চাকরীর কোন নিরাপত্তা নেই, নেই কোন নির্দিষ্ট বেতন হার। এই জেলায় প্রায় ১০ হাজার লোক এই পুতুলনাচ শিল্পের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। এই সব দলের প্রযোজক, পালাকার, শিল্পী ও কর্মচারীদের প্রায় সবাই তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত। দেশ ভাগাভাগির পর পূর্ব-পাকিস্তান বা বর্তমানে বাংলাদেশের খুলনা, যশোর, ফরিদপুর ও বরিশাল ছেড়ে এঁরা এই এলাকায় এসে নয়াবসতি গড়ে তুলেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আগে অবিশ্যি সখের পুতুলনাচের দল গড়ে অনিয়মিত-ভাবে নাচ দেখিয়ে বেড়াতেন'।[২]

* ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দের ৩০-৩১ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচের এক কর্মশালায় উপস্থিত থেকে কোলকাতার দুই দৈনিকের ['আজকাল' ও 'বর্তমান'] দুই সাংবাদিক [শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, পুলকেশ ঘোষ] দুটি প্রতিবেদন উপস্থিত করেছিলেন [যথাক্রমে ১৬ ১১ ৮৭. ও ১৮. ১১ ৮৭.]। বলাবাহুল্য এখানে সাংবাদিক সুলভ চকিতপ্রেক্ষণ প্রযুক্ত হয়েছে এবং মন্তব্যও হয়েছে দ্রুত-ভাবনাজাত এবং অগভীর। কিন্তু তা-সত্ত্বেও এঁরা এঁদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি না-ভেজাল প্রীতির বশে উক্ত কর্মশালায় এমন কিছু লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন, যা ছিল অভ্রান্ত। ফলে, এই শিল্পের যা প্রকৃত অবস্থা তাকে তাঁদের প্রতিবেদন অনেকটা নিশ্চিত ভাবে বিদ্ধ করতে পেরেছে বলে মনে করি। ঐ দুই সাংবাদিকের আন্তরিকতার যতটুকু আমাদের আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় ততটুকু এখানে উদ্ধৃত হলো :

১. আজকাল :

"অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে দুপুর দুটো নাগাদ শুরু হয়, কর্মশালায়

উদ্বোধন পর্যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কর্মশালার প্রকৃত অর্থানুযায়ী প্রতিবেদকের চোখে কিছুই পড়েনি।... পৌরাণিক পালাতে হঠাৎ রাজকাপুর, ছবি বিশ্বাসকে নিয়ে গান গাওয়া হল কেন? প্রতি-বেদকের প্রশ্নের জবাবে দলের মালিক শম্ভুনাথ মণ্ডল: 'সবই মনোরঞ্জনের জন্য। যেভাবে ভি-ডি-ও মফস্বলে নিজের জায়গা করে নিয়েছে, সেক্ষেত্রে একঘেয়ে রাম-রাবণের গল্পো শুনতে গ্রামের মানুষও এখন নারাজ। তাই তাদের বেঁধে রাখার জন্য আমাদের শেষ অস্ত্র রুপোলি পর্দার নায়ক-নায়িকারা।' ভি-ডি-ও-র সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো আর্থিক স্বচ্ছলতা তাঁদের নেই। এমন কি, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগে পুতুলনাচের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কোনও ব্যবস্থাই নেই। অথচ তাঁদের বিশ্বাস, উচিত প্রশিক্ষণ পেলে তাঁরাও প্রতিযোগিতায় নামতে পারেন। লোকসংস্কৃতির এই উপেক্ষিত শাখাটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন অবলীলায়। প্রদর্শনীতে আয়ের থেকে ব্যয় তাদের বেশি। কারণ, এখনও তাঁরা চুঙ্গিকর, প্রমোদকর, বৃত্তিকর ইত্যাদির ফাঁস থেকে মুক্তি পান নি। যে-কোনও জায়গায় প্রদর্শনীর জন্য থানা-মহকুমা শাসক পর্যায়ের দশ-বারোটি অফিস ছোটাছুটি করে অনুমতি নিতে হয় তাঁদের। কর্তাদের ইচ্ছামতো টাকার দাবি মেটালে তবেই তাঁদের কপালে জোটে আসর বসাবার জায়গা। মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তাঁদের এ-ধরণের সাজগোজ করতে করতেই ফুরিয়ে যায় মরসুম। সহজে বিদ্যুৎ না পাওয়ার কৌশল থেকেও দলগুলো কেউই রেহাই পায় না। বহু হয়রানি বা বহু অর্থদণ্ডের পর যদিও বা মাত্র ১৪ দিনের জন্য অনুমতি মেলে, কিন্তু নির্দিষ্ট দিনের শেষে দলের গচ্ছিত অগ্রিম অর্থ ফেরত পেতে লেগে যায় বছর তিন। এ-ভাবেই বিদ্যুৎ অফিসে পড়ে আছে বহু দলের বেশ কিছু টাকা। বহু সমস্যার মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে ভিন রাজ্যে পুতুলনাচ

দেখানোর সমস্যাটিও প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা-কালীন। অন্য রাজ্যে প্রদর্শনীর জন্য যেহেতু কোনও বৈধপত্র তাঁদের নেই, যেহেতু বাঙ্গালী অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে তাঁদের প্রদর্শনী করতে হয়, প্রাণ হাতে নিয়ে।

" ..নদীয়ার শিবিরে গিয়ে জানা গেল, পুতুলের সৃষ্টিকর্তা তাঁরাই। আজও তাঁরা সেই ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছেন কোনও মতে। কিন্তু দারিদ্র্যের প্রকটতায়, আর্থিক অনটনের চাপে, গত ১০ বছরে উঠে গেছে ৫০ ভাগ দল। প্রায় হাজার পাঁচেক মানুষ পুতুলনাচ ছেড়ে নিযুক্ত হয়েছেন অন্য পেশায়। কমবেশি সকলেই বয়ে বেড়াচ্ছেন হাজার দশেক টাকার ঋণের বোঝা। বেশ কিছু দলের মালিকানাও হস্তান্তরিত হয়েছে। 'কেন এই দল কেনা বেচা ?' প্রথমত মূল্য বৃদ্ধির দাপটে দলগঠন ও পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি। পুতুল-নাচ প্রদর্শনের জন্য সরকারি অনুমতি প্রাপ্তির পিছনে অকারণ হয়রানি, অলিখিত প্রশাসনিক নির্যাতন এবং আরও বহুমুখী সমস্যা।

" সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং। তাই মিলন সভাতে পর্ষদের সদস্য-সচিবের বক্তব্য 'এখনই কিছু নয়,' 'ধীরে ধীরে কাজ এগুবে। 'আপনারা হাঁটবেন, আমরা সাহায্য করব।' এ-ধরণের নিরুৎসাহী মন্তব্যগুলি ঠিক মেনে নিতে পারিনি। অথচ চাইলেই কয়েকটি জরুরী সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। শিল্পীদের অ-মরসুমে সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন সরকারী হলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রদর্শনীর উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। কলকাতার নামী-দামী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলকে দেয় বরাদ্দ সরকারী অনুদানের মতো, অভাবগ্রস্ত পুতুলনাচ সংস্থাগুলিকে দেবার কথা ভাবা যেতে পারে। গবেষণা, প্রশিক্ষণের জন্য একটি স্থায়ী মঞ্চ গঠন করা যেতে পারে। বাণিজ্যিক ভি-ডি-ও প্রদর্শনে কঠোর বিধিনিষেধ জারি করা যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে বা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ

নিয়ে দলের ব্যয় বহুল সম্পত্তি যেমন জেনারেটর, মাটাডোর, আলো ইত্যাদি কেনাব সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত জায়গায় প্রদর্শনীর জন্য বৈধপত্র দেওয়া চালু করা যেতে পারে।"

২ বর্তমান ঃ

"নদীয়া জেলায় মুড়াগাছা কলোনি, বরণবেড়িয়া ও অন্যান্য অঞ্চল মিলিয়ে প্রায় একশো দল এখনও আছে। কিন্তু কম বেশী প্রতি দলেবই ঘাড়ে হাজার পাঁচেক ঋণের বোঝা। কথা হচ্ছিল মুড়াগাছার দুলালচন্দ্র বৈষ্ণবের সঙ্গে। পঞ্চাশ বছর বয়স এখন। ২৬ বছর ধরে যুক্ত আছেন পুতুলনাচের সঙ্গে। এখন নিজে একটা দলের মালিক। বাজাবে দুলালবাবুর ধার হাজার সাতেক টাকা। বাঁকুড়ার রামপুর গ্রামের স্বপন ব্যানার্জীও একটা দলের মালিক। তাঁরও ধার ছ-হাজার টাকা।

"দুলালবাবু আগে দল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলা বাদেও বিহার ও উড়িষ্যায় গিয়ে 'শো' করেছেন। কিন্তু আজ তাঁর বাজার পড়ে গেছে। সংসারে সাতজন লোক। চালাতে পারেন না। দুর্গাপুজোর ঠিক আগে দল নিয়ে বাইরে বেরোন, ঘরে ফেরেন চৈত্র সংক্রান্তির পর। লাইট, মাইক সব ধার করে নিয়ে বেরোন। প্রতিবারই ফিরে দেখেন হাজার দেড়েক টাকা বাজারে ধার থেকেই যাচ্ছে। এ-ভাবে প্রতি বছর বাড়ে ধারের অঙ্ক। শুধু নদীয়ার দুলালবাবু নয়, বাঁকুড়ার স্বপন ব্যানার্জী বা মেদিনীপুর জেলার পদ্মতামলি গ্রামের রামপদ ঘোড়ুই সবার অবস্থাই এক।

"এত ধার হওয়ার কারণ কী? জবাবে দুলালবাবু একটা বাঁধানো খাতা বার করলেন। পুতুলনাচের দল সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে? স্বীকার করলাম নেই। দুলালবাবু বললেন, অন্ততপক্ষে

জনা চোদ্দ-পনের লোক লাগে। তাদের বেতনের হারটা শুনুন একবার।

১) মাস্টার [যিনি নানান গলায় অভিনয় করেন] ১০০০ টাকা
২) নাচিয়ে [যিনি পুতুল নাচান] ৫০০ টাকা
৩) নাচিয়ের সাহায্যকারী ৩০০ টাকা
৪) দোহার [গায়ক] ২৫০ টাকা
৫) বাজিয়ে [তবলা] ৪৫০ টাকা
৬) বাঁশি বাদক ৪০০ টাকা
৭) ম্যানেজার ৫০০ টাকা
৮) গেটম্যান - ২ জন ৬০০ টাকা
৯) টিকিট মাস্টার ৪০০ টাকা

এ-ছাড়াও লাইটম্যান, মাইকম্যান ও অন্যান্য কর্মী মিলিয়ে পনেরো জনের দল। এঁদের জন্য প্রতি মাসে খরচ ৫,৭৫০ টাকা। অর্থাৎ প্রতিদিন খরচ ২৬১ টাকার মত। কাজেই অন্ততঃ পক্ষে প্রতিদিন ৪০০ টাকা রোজগার প্রয়োজন। কিন্তু বেশির ভাগ দিনই তা জোটে না। গ্রামে গ্রামে এখন ভি ডি-ও-র চল শুরু হয়েছে। ৫০ পয়সা দিয়ে পুতুলনাচ দেখার চেয়ে ১ টাকা দিয়ে ভি-ডি-ওতে সিনেমা দেখতে গ্রামের ছেলেমেয়েরা বেশি আগ্রহী। এছাড়াও দাম বেড়েছে পর্দা ও স্ক্রীনের, এমন কি পুতুলেরও। স্বপনবাবু জানালেন, বাঁকুড়ায় যেহেতু পুতুলনাচের চল বেশি নেই তাই সেখানে প্রত্যেকের মজুরিও বেশি দিতে হয়। এ-সব কারণেই প্রতি বছর ধার বাড়ছে।

"দুলালবাবু, স্বপনবাবুই জানালেন, লাভ নেই দেখে নতুন প্রজন্মের ছেলেরা আর এদিকে আসছে না।"

৩. দস্তানা পুতুলনাচ :

খুবই দুর্ভাগ্য এতবড় একটি সাংস্কৃতিক মাধ্যম কারোর কাছ থেকেই,

সমাদর তো দূরে থাক, সহানুভূতিপূর্ণ কোন মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলো না,—'বেঁদী পুতুল' নামের অবজ্ঞা নিয়ে এই লোককলা কোনক্রমে বেঁচে আছে। আমরা এ প্রসঙ্গে আগেই [পৃ. ৩৭—৪৩] বিস্তৃত আলোচনা করে এসেছি। একজন দস্তানা পুতুলনাচের শিল্পীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাই-ই এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

১. নাম : রাজেন্দ্র ঘোড়ুই।

২. বয়স : ছাপ্পান্ন বছর।

৩. পিতা : প্রয়াত যোগী ঘোড়ুই। ইনি প্রায় পঁচাত্তর বছর বয়সে মারা যান।

৪. ঠিকানা : গ্রাম—পদ্মতাম্বলী। পোঃ—পদ্মতাম্বলী। থানা—ভগবানপুর। মহকুমা—কাঁথি। জেলা—মেদিনীপুর।

৫. শিক্ষা-দীক্ষা : রাজেনবাবু লেখাপড়া কিছুই জানেন না। তবে কোন রকমে সইটা করতে পারেন। সাধারণত টিপছাপই দিয়ে থাকেন।

৬. পারিবারিক প্রসঙ্গ : রাজেনবাবুর পরিবার বলতে স্ত্রী, তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। ইনি ত্রিশ বছর বয়সে বিবাহ করেন। একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বাকিরা ছোট। ছেলেরা পড়াশুনা কিছুই করে না। বড় ছেলের বয়স বার-তের। তেমন কিছু করে না। অল্প-স্বল্প পুতুলনাচাতে পারে। কেবল পুতুলনাচালেই হয় না, মোটামুটি রকমের গানও গাইতে পারা চাই। এ-বিষয়ে তার এখন যোগ্য পারদর্শিতা গড়ে ওঠেনি।

রাজেনবাবুরা তপশিলী সম্প্রদায়ের মানুষ। এঁদের আদি পেশা ছিলো পাল্কী বহন। এঁরা এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। এই অঞ্চলের এক-শ পরিবার আছেন তাঁদের সম্প্রদায়ের। আজ তাঁদের অনেকেই দস্তানা পুতুলনাচের সঙ্গে যুক্ত আছেন। রাজেনবাবুর বরাবরই ললিতকলার প্রতি আকর্ষণ আছে। পেশায় শ্রমজীবী—

অক্ষরজ্ঞানশূন্য এবং ব্রাত্য-জনগোষ্ঠীর মানুষ হলেও কুড়ি বছর বয়সে ইনি স্থানীয় এক যাত্রা দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। প্রায় পনের ষোল বছর যাত্রার দলে থেকে 'কপালকুণ্ডলা', 'সবার দেবতা', 'জয়যাত্রা', 'সতীরঘাট, 'শয়তানের চর, 'বর্গী এলো দেশে' ইত্যাদি অনেকগুলি পালায় কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তবে নায়কের পার্ট না পেলেও কিছু গান থাকতো যে চরিত্রে, সেই চরিত্র তাঁকে দেওয়া হতো এবং তিনিও সেই ধরণের চরিত্রে অভিনয় করতে ভালবাসতেন। আজ প্রায় দশ বার বছর তিনি যাত্রা করা ছেড়ে দিয়েছেন।

৭. দল-পরিচয় : বর্তমানে এই পুতুলনাচ কোন দল করে অনুষ্ঠিত হয় না। একজন পুতুলনাচিয়ে একটি মেয়ে ও একটি ছেলে পুতুল ঝুলির মধ্যে ভরে বেরিয়ে পড়েন দেশে-বিদেশে নাচ দেখাতে, সঙ্গে কোন বাদ্যযন্ত্র নেই—কোন দোহারকি নেই, নেই কোন সহকারী। একেবারে একা। রাজেনবাবু জানান যে চিরকাল কিন্তু এমন ছিলো না। আগে চার থেকে ছয় জন থাকতেন প্রতি দলে [কখনও আট জনকে নিয়েও দল গঠিত হতো]। ঢোল অথবা ঢোলক, করতাল বা জুড়ি, সানাই বা আড় বাঁশী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের শিল্পীরা ; আর কম পক্ষে দশ বা ততোধিক নাচিয়ে থাকতো দলের সঙ্গে। যাঁরা পুতুল নাচাতেন তাঁদেরই মধ্যে সর্বাধিক সুকণ্ঠের অধিকারী হতেন মূল গায়েন, আর অন্যরা তাঁর সঙ্গে দোহার হিসাবে কণ্ঠ মেলাতেন [এ-বিষয়ে, ৩৯-৪৩ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে]। রাজেনবাবুর নিজেরই ছটি পুতুল ছিলো। নিজস্ব কোন বাজনদার না থাকলেও গান গাইতে যাওয়ার সময় বিভিন্ন হারের মজুরিতে ইনি বাজনদার ভাড়া করে নিয়ে যেতেন। নিজে ভালো গান করতে পারতেন বলে মূল গায়েন ভাড়া করতে হতো না।

৮. পালা-পরিচয় : ভাডের বা সুতোর টানা পুতুলের মতো নাটকীয়তা

পূর্ণ যাত্রা পালা বা থিয়েটারের বই এই নাচের পালায় ব্যবহৃত হতো না বা এখনও হয় না। প্রশ্নোত্তরমূলক পাঁচালী ধরণের গান কোন এক গ্রাম্য-কবি রচনা করে দিতেন ; তাই ই হাতে ধরা পুতুলের নাচের সঙ্গে সঙ্গে গাওয়া হতো। আমরা আগে সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি গানের কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে এসেছি। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় বলা ভালো যে, যাঁরা এই পুতুল নাচান তাঁদের সম্প্রদায়ে লেখাপড়ার চল কোনদিনই প্রায় ছিল না, কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বভাব প্রতিভার শক্তিতে অপূর্ব সব গান রচনা করতেন,—যাতে তাঁদের শাস্ত্র ও পৌরাণিক জ্ঞান এবং জীবন-রস-রসিকতা গভীর ও সুচারুরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এঁদের পালার বিষয়বস্তু হলো : শাস্ত্রীয় ও লৌকিক পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত, ঘর-গৃহস্থালীর কথা, সামাজিক সমস্যা এবং তার ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি তীক্ষ্ণ ও সরস ব্যঙ্গ।

৯. পুতুল-প্রসঙ্গ : একটা পুতুলের উচ্চতা হয় মোটামুটি ভাবে ফুট দেড়েক। পুতুলের হাত দুটি হয় হালকা কাঠের। মুণ্ডুটা ভালো পুতুল তৈরির কারিগর দিয়ে ঠিক মানানসই করে তৈরি করতে হয়। হাত দুটি ও মুণ্ড হাল্‌কা কাঠের তৈরি 'বডির' সঙ্গে সাঁটা থাকে এবং পোষাক দিয়ে দুই হাত সহ সমস্ত 'বডি' ঢাকা থাকে। এবং ঐ ঝোলা পোষাকের নিচে দিয়ে হাতের পাঁচটি আঙ্গুল শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চালিয়ে প্রয়োজন মতো নাচানো হয়ে থাকে [সঙ্গের আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য]। কাগজের মণ্ড ও মাটির লেই দিয়ে হাতের আঙ্গুলগুলি তৈরি করা হতো। ইদানীং সেখানে দুটি টিনের চাকতি পেরেক দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে [অবশ্য সবাই এমন দেন না]। ফলে, পুতুল নাচিয়ে আঙ্গুল দিয়ে হাত দুটিকে ঠুকলেই ঝম্‌ঝম্ করে আওয়াজ হতে থাকে। রাজেনবাবু জানালেন যে একটি পুতুলের মুণ্ড তৈরি করতে ছয় থেকে দশ টাকার মতো লাগে। তাঁর কাছে বর্তমানে যে দুটি পুতুল আছে তার মুণ্ড দুটি করিয়েছেন কোলকাতার উল্টোডাঙ্গার

খালের উত্তর পাড়ে যে দু-এক ঘর মৃৎশিল্পী আছেন তাঁদের কাছ থেকে। পুতুলের সাজ-পোষাক, পুঁতির মালা, মাথায় জরির মুকুট ইত্যাদির জৌলুশ বা চাকচিক্যের হ্রাসবৃদ্ধি ব্যক্তিগত সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল।

১০. আর্থিক অবস্থা : ওপরে রাজেনবাবুর যে পারিবারিক ও দলের পরিচয় রেখে এসেছি তাতে তাঁদের মতো শিল্পীর সার্বিক জীবন-পরিচয় ফুটে উঠেছে। তবুও রাজেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেছে যে, তাঁর বসত জমিটুকু নিজস্ব—কাঠাখানেকের মতো হবে। গাই-আর এঁড়ে মিলিয়ে তিনটি গরুর মালিক তিনি। কিছু হাঁস-ছাগলও আছে। পুতুলদুটি ঝোলায় ফেলে—সমগ্র পরিবারকে অদৃষ্টের হাতে সঁপে দিয়ে যখন তিনি দেশ-দেশান্তরে ভেসে পড়েন তখন গান গেয়ে ও পুতুলনাচ দেখিয়ে গড়ে গোটা ত্রিশ টাকার মতো রোজগার হয়। এর থেকে বাদ যায় নিজের খোরাকি—চা-বিড়ি ও গাড়ী ভাড়া। এককালের প্রতিষ্ঠিত শ্রমকারী মানুষ, জাতশিল্পীর এই উঞ্ছবৃত্তিকে ভিক্ষা ছাড়া আর কি বলা যায়! মাঝে মাঝে রাজেনবাবুকে পথে ছিনতাইবাজদের হাতে পড়ে পুতুল দুটি ছাড়া সর্বস্ব খোয়াতে হয়। কারণ নাচ দেখিয়ে বেড়াবার সময় এঁদের অবস্থা 'ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে' হওয়ার কারণেই এমন দুর্ঘটনায় পড়তে হয়। বর্তমানে রাজেনবাবুর পুতুল নাচানোই একমাত্র পেশা—এ ছাড়া আর কিছুই করেন না। বৃষ্টির কয়েক মাস ছাড়া, বছরে প্রায় আট-নয় মাস দেশে-বিদেশে পুতুলনাচ দেখিয়ে বেড়ান। কখনও একটানা বাইরে থাকেন,—কখনও মাঝে দু-একবার বাড়ী ফিরে এসে পরিবার পরিজনের সন্ধান নিয়ে যান—কিছু টাকা পয়সাও বাড়িতে দিয়ে যান। নাচ দেখাতে দেখাতে এঁরা মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-বর্দ্ধমান হুগলী-২৪ পরগণা-কোলকাতা এমন কি টাটানগর-আসানসোল পর্যন্ত চলে যান। অর্থাৎ যেখানেই যখনই কিছু রোজগারের সম্ভাবনা দেখেন,

তখনই সেখানে গিয়ে হাজির হন [সাক্ষাৎ গ্রহণের তারিখ ৩রা মে ১৯৮৭]।

* মন্তব্য : এই দস্তানা পুতুল সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিক কোলকাতার এক দৈনিকে যে প্রতিবেদন রেখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা গেল না। তিনি লিখছেন : 'দক্ষিণ মেদিনীপুরের বেণীপুতুল নিয়ে মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন রামপদ ঘোড়ই। ফ্যামিলি প্ল্যানিং, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এবং ভক্তিমূলক গানের তিনটি পুতুল নাচের আইটেমই ছিল মজাদার। রামপদর কাছ থেকে জানা গেল বেণীপুতুল নাচ হল সেই নাচ যা দেখিয়ে বারোমাস রোজগার করা যায়। অন্যান্য পুতুল নাচের যেমন মরসুম থাকে, এ-খেলাতে সে সব কোনও বালাই নেই। শুধু দুটো পুতুল হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার অপেক্ষা। তারপর যেদিকে দুচোখ যায়। সাত বছর বয়স থেকে রামপদ নাচ দেখান। গান লেখেন। সুর দেন। এ-পর্যন্ত তাঁর গানের সংখ্যা প্রায় ৮০টা। কলকাতায় এলে রামপদর আয় হয় গড়ে ২০ টাকা। গ্রামে গঞ্জে অর্থ মেলে না বটে, কিন্তু তাঁর ছোট্ট সংসারের পেটের সমস্যাটা মিটে যায় কোন মতে। রামপদ নিজেই বললেন—এতো এক ধরণের ভিক্ষাবৃত্তি। শুধু এই করেই চলছে মেদিনীপুরের কয়েক-শ সংসার' [দ্র. 'আজকাল' : ১৬ই নভেম্বর ১৯৮৭]।



৬.

ঃ প্রসঙ্গ পুতুল ঃ নির্মাতা ঃ

পুরুলিয়ার ছৌ-নাচের মুখোশ তৈরির জন্য যেমন নির্দিষ্ট একটি গ্রামে, নির্দিষ্ট এক শিল্পী-সম্প্রদায় বসবাস করেন, ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের আলোচ্য তিন ধরণের পুতুলনাচের জন্য কোন নির্দিষ্ট কারিগরগোষ্ঠী কোথাও বসবাস করেন না। প্রসঙ্গত, এ-কথাও ঠিক যে, ছৌ-নাচের যাঁরা মুখোশশিল্পী মুখোশ নির্মাণই তাঁদের সাম্বৎসরিক জীবিকা নয়, তবুও বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময় মোটামুটিভাবে একটি গ্রামে একই পদবীর [সূত্রধর] কিছু মানুষ নিয়মিতভাবে মুখোস তৈরি করে থাকেন,—ফলে এটিকে তাঁদের 'সিজিন্যাল প্রফেশন' বলা যায়। কিন্তু কি ডাণ্ডের, কি সুতোয়টানা, কিংবা দস্তানা পুতুল তৈরির ক্ষেত্রে এমন কোন জীবিকাধারী মানুষ-জনদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। অতএব 'পুতুলনাচের পুতুল নির্মাতা' এ-রকম কোন সম্প্রদায় যেমন নেই, তেমনি তাকে অবলম্বন করে কোন নির্দিষ্ট বৃত্তিগত অর্থনৈতিক কাঠামোও দেশে গড়ে ওঠেনি ;—যেমন ছৌনাচের ক্ষেত্রে উঠেছে। ফলে, পুতুলনাচের 'পুতুল নির্মাতা' বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ খুবই কম। তথাপি এ-বিষয়ে যতটুকু সংবাদ পাওয়া সম্ভব আমরা পর্যায়ক্রমে সেইটুকুই এখানে আলোচনা করবো।

ক. ডাণ্ডের পুতুল ঃ

এই পুতুলনাচের পুতুল মূলত দু-ভাগে তৈরি হয় অর্থাৎ মুণ্ড ও বডি আলাদা-আলাদা প্রক্রিয়ায়। যেমন যে অঞ্চলে এই শ্রেণীর পুতুলনাচের প্রচলন আছে সেই এলাকার পুতুলনাচের দলের মালিক তাঁরই পরিচিত সূত্রধরের কাছে গিয়ে, [ইনি ঐ এলাকার হতে পারেন বা নাও পারেন] নির্দেশ দিয়ে নিজের পছন্দ মতো পুতুল তৈরি করিয়ে নেন। অনেক সময়ে নিজেরাই 'বডি-র' কাঠ সংগ্রহ

করে দিয়ে আসেন ঐ সূত্রধরকে। প্রসঙ্গত বলা ভালো যে, যে কোন হেতুড়ে সূত্রধর হলেই চলবে না—এই ধরণের পুতুল তৈরির সংস্কার যাঁদের আছে, তাঁরাই কেবল পারেন ভালো পুতুল বানাতে। এ-বিষয়ে দেখা গেছে যে দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার যে সমস্ত অঞ্চলগুলিতে ডাঙের পুতুল নাচের প্রচলন আছে, সেইসব এলাকার কাছে-পিঠেই এই পুতুল তৈরির সূত্রধরদের বাস।

আমরা আগে বলেছি যে ডাঙের পুতুলের 'বডির' এবং মুণ্ডের নির্মাণ কৌশল এক নয়। কারণ, মুণ্ড নির্মাণের জন্য একই সঙ্গে সূত্রধর ও কিছুটা মৃৎশিল্পীর সাহায্য নিতে হয়। সূত্রধর মুণ্ডের আদলটি তৈরি করে গলার নিচে একটি ফুটখানেকের মতো লম্বা গজাল পুঁতে দিলে, মৃৎশিল্পী মাটির লেই ও ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে মুখমণ্ডলে একটি আস্তরণ তৈরি করে নেন, যাতে—তাতে রঙ ধরানো যায়। তারপর তাতে মাটির লেই দিয়ে নাক, চোয়াল, চিবুক ইত্যাদি তৈরি করা হয়। পৌরাণিক চরিত্রানুযায়ী মুখমণ্ডলে রঙ করে, বাজার থেকে শনের চুল কিনে এনে ছোটছোট পেরেক দিয়ে মাথায় সেঁটে দেওয়া হয়। এবং তেল রঙ নয়, মৃৎশিল্পীরা মাটির প্রতিমাতে যে রঙ ব্যবহার করেন এখানেও সেই একই রঙের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তাই ডাঙের পুতুলের মুণ্ড তৈরির প্রক্রিয়া অনুসরণে বলতে পারি যে, এটি সূত্রধর ও প্রতিমাশিল্পীর যৌথ প্রক্রিয়ায় নির্মিত। অবশ্য আমরা এমনও জানি যে, কোন কোন পুতুল নাচিয়ের দলের মালিক বা ঐ দলের অন্য কেউ পুতুলের মুণ্ডে রঙ করা, বা সাজানো অল্প-স্বল্প মেরামতি ইত্যাদির ব্যাপারে নিজেরাই যথেষ্ট দক্ষ। সচরাচর তাঁরা কোন মৃৎশিল্পীর সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। হাত দুটিতে হলদে, সবুজ রঙ [জল রঙ] করা ছাড়া সারা বডিতে আর রঙ করার দরকার হয় না। কারণ, তা পোষাকেই ঢাকা থাকে।

এক একটি পুতুলের বডি তৈরি করতে চল্লিশ-পঞ্চাশ থেকে একশ টাকা পর্যন্ত মজুরী নিয়ে থাকেন নির্মাতারা। কাঠের দাম আলাদা। সখি পুতুলের নির্মাণের মজুরী কিছু বেশি, কারণ তার শরীরে খিলান অনেক বেশি। সখিকে কোমর বেঁকিয়ে ও হাত নেড়ে, কনুই ভেঙে নাচ দেখাতে হয়। পুতুলের

পোষাক পুতুল নাচিয়েরা নিজেরাই পরিয়ে নেন ও খুলে রাখেন। এ-বিষয়ে দলের প্রায় প্রত্যেককেই কম বেশি পারদর্শিতা অর্জন করতে হয়। কারণ, নাচানোর সময় ছাড়া পুতুলের মাথার চুল-পোষাক সবই খুলে বাক্সবন্দী করে রাখা হয়।

খ. সুতোয়টানা পুতুল :

এই পুতুল নির্মাণের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট কোন কারিগর নেই। বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে সূত্রধর, মৃৎশিল্পী অথবা পুতুলনাচিয়ে মালিক বা তাঁর দলের কোন দক্ষ কর্মচারীও এই পুতুল তৈরি করে থাকেন। যেমন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে, মেদিনীপুর জেলার বামুন আড়া গ্রামের [পোঃ ঈশ্বরপুর] প্রয়াত ভাকু বাড়ুই [সূত্রধর] খুব ভালো সুতোয়টানা পুতুল তৈরি করতে পারতেন। শোলা কিনে দিলে তিনি ত্রিশ থেকে ষাট টাকার মধ্যে [আজ থেকে পনের/কুড়ি বছর আগে] তিনি এক একটি পুতুল বানিয়ে দিতে পারতেন। কিভাবে সুতোয়টানা পুতুল তৈরি হয় তার কিছুটা বিবরণ বর্তমান গ্রন্থের ১০-১১ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। অতএব পুনরুক্তি এড়িয়ে এ-সম্পর্কে বলা যায় যে ডাঙের পুতুলের মতো এখানেও এই পুতুল নির্মাণকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কোন বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় তৈরি হয় নি। এর প্রধান কারণ, পুতুলনাচ নামক কলামাধ্যম নিজেই মুমূর্ষু—তা অন্যকে বাঁচাবে কি? দ্বিতীয়ত, একটি পুতুল তৈরি করতে পারলে তা অনেকদিন পর্যন্ত চলে। তৃতীয়ত, ছৌ-নাচের মুখোশের মতো এই পুতুল দু-চার বার নাচের পরেই ভেঙ্গে যায় না। তাই কুড়ি-পঁচিশ বছরের পুরাতন বেশ কিছু পুতুল অনেক দলেই দেখতে পাওয়া যায়। ফলে, নিয়মিত চাহিদা না থাকায় এবং নতুন নতুন দলের উৎপত্তির অভাবে পুতুলনাচের জন্য নতুন নতুন পুতুলেরও প্রয়োজন হয় না।

এই পুতুলনাচেও শনের চুল এবং চরিত্রানুযায়ী রকমারি পোষাক বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে নাচিয়েরাই পালার প্রয়োজন মতো ব্যবহার করে থাকেন। ডাঙের পুতুলের মতো এর পোষাক নাচের পর সাধারণত খুলে রাখা হয়। ছোট

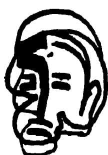
পুতুলগুলিকে অনেক সময় পোষাক শুদ্ধই বাক্সবন্দী করা থাকে।

গ. দস্তানা পুতুল :

এই পুতুলের নির্মাণ কৌশল যেমন সরল, খরচও তেমনি সামান্য। কেবল মুণ্ডুটিকেই, মাটির পুতুল তৈরি করেন এমন শিল্পীর কাছ থেকে তৈরি করিয়ে নিতে হয়। তাঁরাই রঙ করে চোখ-মুখ এঁকে দেন। তারপর পুতুল যিনি নাচান তিনি পুতুল অনুযায়ী পোষাক তৈরি করিয়ে নেন। এই পুতুলের নির্মাণ কৌশল ও তার কারিগর সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ৮০-৮১ পৃষ্ঠায় রাজেন ঘোড়ই মহাশয়ের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করে এসেছি। অতএব এখানেও সে-বিষয়ে অতিরিক্ত কিছু বলার নেই; কেবল এটুকুই দেখা যাচ্ছে যে এই পুতুলের নির্মাণ ব্যাপারে কোন স্থায়ী, পেশাদারী নির্মাতাগোষ্ঠী তৈরি হয়ে উঠতে পারে নি।

অথচ, সেই সুযোগ ছিলো। যাঁরা—সরকারী বা বে-সরকারী সংস্থা, লোক-শিল্প কলাকুশলীদের উৎসাহ দিয়ে থাকেন, তাঁরা কিন্তু অবহেলিত অথচ প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন এই শিল্পকে উৎসাহ দিতে পারেন। এতে করে : ক) একটি শিল্পীগোষ্ঠী স্থায়ীভাবে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন পাবে; খ) একটি লোকশিল্প তৈরি হবে; গ) এই পুতুলগুলি দেশ-বিদেশের কলারসিকগণ উৎকৃষ্ট শিল্প-নিদর্শন হিসাবে সংগ্রহ করতে অনুপ্রাণিত হবেন।

সমগ্র বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা ও ভাবনা-চিন্তা করার অবকাশ আছে বলে মনে করা যায়।



৭.

: পুতুলনাচ : ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক :

সব দেশের মতো আমাদের দেশেও পুতুলনাচের দুটি ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। বিদেশের কথা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা বিচার করতে পারা যায়নি : বলেই সে-সব দেশে ঐ দুই ধারার বহমানতা এবং দুয়ের মধ্যে সম্পর্কের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকাই উচিত মনে করি। বই-টই পড়ে অথবা দুই-বা-তিন হাত ফেরতা তথ্য যোগাড় করে এ-বিষয়ে পণ্ডিতি মতামত দেওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু সরেজমিনে তদন্ত এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক কোন কিছু সম্পর্কে কোন মন্তব্য করাকে আমার অসমীচীন বলে মনে হয়।

আমাদের দেশে ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচ [Traditional puppetry] এবং আধুনিক পদ্ধতির পুতুলনাচ [Non-traditional puppetry]—এই দুই ধারা রীতিমত নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সমান্তরালভাবে দুই বিপরীত মুখে বয়ে চলেছে। ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই ঐতিহ্যবাহী নানা ধরণের পুতুলনাচের ধারা আজও নানা বৈশিষ্ট্যসহই জীবন্ত। তারই পাশে পাশে সেই প্রদেশের অন্তর্গত প্রধানত বড় বড় শহরকেন্দ্রিক শিক্ষিত এবং বহুবার বিদেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কিছু কিছু উৎসাহী মানুষ প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিদেশী পুতুলনাচের অণুকরণে পুতুলনাচিয়ের দল খুলে, বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ আধুনিক একটি ধারা তৈরি করে ফেলেছেন। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে—ক. ঐ দুই ধারার স্বরূপ কি [সমগ্র ভারতের প্রেক্ষাপটে,—প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে] ? খ. উভয় ধারার মধ্যে বিরোধ বা সাদৃশ্য কোথায় ? গ. পরস্পর পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত

হয়েছে কি না ? ঘ. উভয়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক কোন সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় কি না ?

ক. পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী [traditional] পুতুলনাচ আজও যাঁরা দেখিয়ে বেড়ান তাঁরা সুপ্রাচীন ধারণা, প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যবহার করে কোনক্রমে গ্রাম্য নিরক্ষর-সরল ও ধর্মপ্রাণ মানুষদের রসপ্রাশন করে চলেছেন। এতে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা আধুনিক মানুষ-মন ও রুচির সঙ্গে ব্যাপকতর অর্থেই খাপ খাওয়াতে পারছেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা আত্মরক্ষার তাগিদে নিম্নতর মানের রুচির সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হচ্ছেন [এই বিষয়ে আমরা আগে বিস্তৃত আলোচনা করে এসেছি]। বড়-শহর বা মহানগরের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মানুষ ঐতিহ্যনির্ভর এই শিল্প-মাধ্যমকে যতটুকু সমাদর করেন বা এঁদের সম্পর্কে কৌতূহল পোষণ করেন, তা যে দেশজ সংস্কৃতির প্রতি আত্যন্তিক ও আন্তরিক অনুরাগের কারণে করেন সেকথা মনে করার কোন কারণ নেই ;—বিচিত্র প্রত্নবস্তুর প্রতি বিস্ময়-মিশ্রিত অবাক হওয়ার ভাবই তার পেছনে কাজ করে। ফলে, আধুনিক, সু-উন্নত, বিজ্ঞান-পরিষেবিত সুলভ জনরুচির পোষক গণ-মাধ্যমগুলির সঙ্গে অসম লড়াইয়ে মার খেতে খেতে এঁরা ক্রমশই পেছিয়ে পড়ছেন,—দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, উচ্চশিক্ষিত ও অত্যাধুনিক কারিগরী বিদ্যায় কুশলী কিছু ব্যক্তি নিজস্ব কল্পনা, বিদেশী পুতুলের অনুকরণ ও প্রধানত বিদেশী প্রয়োগ-কৌশল অনুসরণ [বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুকরণ] করে ঐতিহ্যহীন [Non-traditional] পুতুলনাচ উপস্থিত করছেন। অনেক সময় এঁরা রামায়ণ-মহাভারত-আরব্য-রজনী বা অন্য কোন রূপকথার কাহিনীকে গ্রহণ করছেন ঠিকই, কিন্তু তাতে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নাড়ীর স্পন্দন শোনা যাচ্ছে না—মাটির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না ;—তাঁরা ফ্ল্যাট-বাড়ীর উত্তরমুখী চার × তিন বারান্দায় টবের গাছে ফোটা সিজন ফ্লাওয়ারের মতোই হয়ে থাকছে। আবার কেউ কেউ নতুনত্বের নামে তাঁদের পুতুল-নাটকে পুতুলের পাশে পাশে জীবন্ত মানুষকে এতখানি যুক্ত করে দিচ্ছেন যে, ঐ মানব-অভিনেতারা পুতুলের ভূমিকাকে গৌণ করে দিয়ে

পুতুলনাচকে [puppetry] 'পাপেট থিয়েটারে' পরিণত করে ফেলছেন। এই ভাবে আধুনিক কালে আমাদের দেশে পুতুলনাচের দুটি ধারা সমান্তরালভাবে দুই ভিন্ন ভিন্ন মুখে বয়ে চলেছে।

খ. উভয় ধারার মধ্যে মূলত কোন বিরোধ নেই এবং থাকার কথাও নয়। সহৃদয় মন নিয়ে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি আন্তরিক প্রীতি নিয়ে, জাতীয় ঐতিহ্যপূর্ণ সম্পদকে রক্ষা করতে, তাদের আধুনিক জীবনের উপযোগী করার কাজে 'যে কোন মূল্য দিতে আমরা প্রস্তুত' এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে এলে উভয়ের মধ্যে বিরোধ বা পার্থক্য ঘোচে। ঐ সব ঐতিহ্যবাহী [traditional] পুতুলনাচকে প্রগতিশীল-জীবনমুখী বিষয়ের মধ্যে স্থাপন করে, কিছু আধুনিক [যা তার পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদ হবে, তার চরিত্র-চেহারায় বিকৃতি ঘটাবে না] প্রয়োগ-কৌশল ব্যবহার করলে আমাদের দেশের সংস্কৃতির উর্বর ক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলতে পারতো। অন্য পক্ষে যাঁরা আধুনিক 'পুতুলখেলা' করেন তাঁরা তাঁদের কলা-কৌশল, প্রয়োগ-পদ্ধতিকে যদি ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচের মূলভিত্তির ওপর স্থাপন করতেন তবে সাধারণ মানুষ তাঁদের চেনা জগতের মধ্যে বাস করে, সুপরিচিত মাটির ওপর দাঁড়িয়েই নতুন ধারণা ও জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধিকে বুঝে নিতে সক্ষম হতেন। আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন প্রাচীনেরা নবীনকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করবেন, আর নবীন প্রাচীনকে শ্রদ্ধা করতে শিখবেন।

গ. প্রাচীন পদ্ধতির পুতুলনাচ [Traditional Puppetry] আধুনিক ধারার [Non-traditional Puppetry] পুতুলখেলার দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত হয় নি। যেমন পুতুল তৈরির ব্যাপারে এঁরা পুরাতন ধারাকেই বজায় রেখেছেন,—মঞ্চনির্মাণ বিষয়েও তাই-ই। তবে ডাঙের পুতুল থিয়েটারের প্রভাবে পরিবর্তন সাপেক্ষ 'সীন', চিত্রিত 'উইংস' যাত্রায় ব্যবহৃত বেশ-ভূষার ব্যবহার করছেন। যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে ঢোল-কাঁশি-হারমনিয়ামের পরিবর্তে, অথবা সঙ্গে, বাঁয়া-তবলা, কর্নেট-ফ্লুট, বেহালা-ম্যায়াকাস ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। নাট্য-পালা পৌরাণিকের পাশাপাশি সামাজিক এমনকি আধুনিক কালের 'হিট' সিনেমা-থিয়েটারের পালাকে অনুকরণ বা অনুসরণ করতেও দেখা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত বলা

ভালো ডাণ্ডের বা সুতোয় টানা পুতুলের ক্ষেত্রে ঐসব পরিবর্তনের বয়সও কিন্তু কম নয়। যাকে আমরা আধুনিক পুতুলখেলা বলছি তার জন্মের অনেক আগেই ঐ-সব ব্যাপার ঘটে গেছে। এই জন্যই আমি প্রভাব না পড়ার কথা উল্লেখ করেছি।

অন্যদিকে যাঁরা আমাদের এখানে আধুনিক পুতুলখেলা নিয়ে চর্চা করছেন, এতে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করছেন ও দেশবিদেশে সেইসব খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁরা মাতৃস্তন্যদুগ্ধের সঙ্গে যে ঐতিহ্য গ্রহণ করেছেন তাকে ভোলেন কি করে? তাই ঐ tradition সম্পর্কে তাঁদের শ্রদ্ধাও কিছুটা আছে, লক্ষ্য করা যায় তাঁরা খোঁজ-খবরও রাখেন কিছু কিছু। কিন্তু অত্যধিক পরানুকরণ প্রবৃত্তি, বিদেশী সম্মান ও অর্থ আহরণের বাধাহীন আকাঙ্ক্ষা [লোভ বলতে পারা যায় কি?], ঐ রক্তলগ্ন ঐতিহ্যবোধকে সংহরণ করতে অথবা নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে বাধা দিয়েছে বা দিচ্ছে। এই কারণেই পরস্পর সাপেক্ষ এবং উভমুখী কোন প্রভাব সৃষ্টি হতে পারেনি। নতুনদের-আধুনিকগণের অদ্ভুত ধরণের এক মানসিকতা উভয়ের মধ্যে যোজক হিসাবে কাজ করার পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-প্রসঙ্গে, আধুনিক ধারার 'পুতুল নিয়ে খেলার' জনৈক বিশেষজ্ঞের এক সাক্ষাৎকারে রাখা কিছু বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি ঐ সাক্ষাৎকারে বলছেন : 'অর্থাৎ কি করছি। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে এতগুলো ঘরানা দেখতে পেয়েছি, নানা ধরণের পুতুলনাচ; সেটা একটুখানি আগে বলে নিই। আপনি তো জানেন, রাজস্থানে কাঠপুতলী আছে। ওড়িষ্যাতেও ঐরকমই এক পুতুল আছে; সেগুলো রাজস্থানী পুতুলগুলোর চাইতে আর একটু বাস্তব। সেটাও সুতো-টানা পুতুল। পশ্চিমবঙ্গে মানুষের আকারের পুতুলের কথা তো আগেই বলেছি আমরা। কিছুদিন আগে আমরা জানতে পেরেছি যে বগুলাতে প্রায় ৫০টি পরিবার পুতুলনাচ করেই খায়। অর্থাৎ তাদের ফসলের কাজকর্ম শেষ হয়ে যাবার পর তারা পুতুল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। শহরে শহরে ঘুরে বেড়ায়। এমন কি তাদের অনেকে নৈনীতাল পর্যন্ত যায়।...কিন্তু এই সবকিছু দেখা-শোনার পর আমার মনে হয়েছে, এই ঘরানাগুলো থেকে শিখবার মতো অনেক কিছু আছে। তাদের দক্ষতা, সামান্য কতগুলো জিনিস দিয়ে একটা নাটক গড়ে

তোলবার দক্ষতা, পুতুলগুলোকে জীবন্ত করে তুলবার দক্ষতা অসামান্য। কিন্তু একটা জায়গায় এসে তারা থেমে গিয়েছে। যদি আমরা মেনে নিই যে সংস্কৃতি বা কালচার একটা জঙ্গম প্রক্রিয়া, একটি অন গোয়িং প্রসেস, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই এগিয়ে চলবে। নাটক যেমন ভরতমুনির সময়েই থেমে নেই, এগিয়ে চলেছে, তেমনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার পুতুলনাচের ঘরানার থেকে শিখবার নানা উপাদান আছে, তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো সম্ভাবনাময়। অসাধারণ একটি আর্ট ফর্ম। কিন্তু কোনো একটা জায়গায় এটা থেমে গিয়েছে।'[১] সত্যই কি থেমে গেছে? আমাদের অভিজ্ঞতা বলে—না। যদি থেমে যেতো তবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কমপক্ষে আট / দশটি থানা-অঞ্চলে পূর্বে আলোচিত তিন ধরণের পুতুলনাচের নেই নেই করেও পাঁচ-ছ-শোটি দল বাঙালীর বহু পুরাতন একটি লোক-ঐতিহ্যকে অক্লান্ত চেষ্টায় আজও বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন না। 'যোগ্যতমের উদ্বর্তনে'র তত্ত্বকে যদি বিজ্ঞান মনস্কতার সঙ্গে গ্রহণ করা যায় তবে বলতেই হবে, যে থেমে থাকে তার বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। তাই যেহেতু এরা আজও বেঁচে আছে, রেডিও-সিনেমা-টিভি-ভিডিও-র পুতনা অবিরত বিষস্তন্য পান করিয়েও এদের মেরে ফেলতে পারছে না, নিজেদের আন্তর শক্তিতেই একান্ত অসম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, তাই আমরা মনে করি এঁরা খুঁড়িয়ে চললেও থেমে যাননি। যতটুকু সাধ্য ততটুকু পরিমার্জনা করে নিয়ে এঁরা বেঁচে আছেন এবং সার্বিক অবহেলা পেয়েও এখনও অনেকদিন থাকবেন।

ঘ. আগেই বলেছি যে আমাদের দেশের পুতুলনাচকে সুস্থ ও স্বস্থ করে তুলে যদি একটি সার্থক প্রমোদ ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গড়ার ব্যক্তিগত / প্রাতিষ্ঠানিক / সরকারী ইচ্ছা থাকে তবে উভয়ের মধ্যে একটি স্থায়ী এবং গবেষণাত্মক দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এই প্রসঙ্গে উক্ত আধুনিক ধারার বিশেষজ্ঞ ঐ একই সাক্ষাৎকারে অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে বলছেন : 'মস্কো পাপেট থিয়েটারের ডিরেক্টর সর্গেই অব্রাৎসভকে বলা হয়, নব্য পুতুল-নাচ ঘরানা তৈরির প্রধান প্রাণপুরুষ। তিনি যখন চীনে যান, সেখানে দেখেন চীনের সনাতন পাপেট থিয়েটারের শক্তি অসম্ভব, কিন্তু প্রায় তা অবলুপ্তির

পথে। তখন তিনি তা বাঁচিয়ে তোলার জন্য অনেক আশ্চর্য কাণ্ড করেন। তিনি বুঝতে পারেন কবি, শিল্পী, ভাস্করেরা এই আর্ট ফর্মটার জন্য কিছু করে না, বা ভাবে না। কোনো নাট্যকার কখনও নাটক লেখে না। কোনো সুরকার সুর তৈরি করে না। এমনই অবহেলা। তাই, তাদের ডেকে নিয়ে তিনি বললেন, এই পুরনো ফর্মের সঙ্গে নতুনের একটা আদান-প্রদান হওয়া সম্ভব কি না। সেই আদান-প্রদানের ফলে চীনদেশের সনাতন পুতুল-নাটক কিন্তু নতুন প্রাণ পেয়েছে। আমাদের দেশে এমন ঘটেনি। কিন্তু বিভিন্ন ঘরানা দেখে আমার ধারণা, আমাদের শিখবার অনেক কিছু আছে। অনুকরণের কথা বলছি না আমি। অনুকরণ কোনো কাজ নয়। এর থেকে অণুপ্রেরণা নিয়ে, ভাবনা নিয়ে নতুন কিছু আমাদের করতে হবে। নতুন ট্রাডিশন তৈরি করতে হবে। তাই আমি যতটুকু কাজ করবার চেষ্টা করি, তার মধ্যে আমি বিভিন্ন ঘরানার অণুকরণের চেষ্টা করি নি।'[২]

আমাদেরও বিশ্বাস কেবল অনুকরণে কেউ বাঁচতে বা বড় হতে পারে না। কিন্তু আদান-প্রদান, সংমিশ্রণ-এর দ্বারা তো বাঁচা ও বাঁচানো যায়। নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে তাদের যুগ যুগ বাহিত জাতীয় ঐতিহ্যকে যে মমতায়, সংবেদনশীলতায় ও বিজ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে সের্গেই বাঁচিয়ে তুললেন তার বিবরণ শুনে [পড়ে নয়, কারণ আমাদের পুতুলনাচিয়েদের মধ্যে আবার অনেকে অক্ষরজ্ঞান-শূন্য] পদ্মতাম্বলী গ্রামের রাজেন ঘোড়ই, রসপুঞ্জির সুদর্শন পুরকাইত, ভগবানখালির শক্তিপদ প্রামাণিক প্রমুখেরা যদি উক্ত সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি আমাদের নিজেদের দেশের-গ্রামের ছেলে হয়ে আমাদের জন্যে কি করেছেন, আমাদের বাঁচাবার জন্য, আধুনিক জীবন-জগতের উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য 'অনেক আশ্চর্য কাণ্ড' কিছু করেছেন কি?" এর উত্তর নঞর্থক হবেই। নইলে, এমন সব চিঠি আমাদের কাছে আসবে কেন?

'স্বপনপুরী পুতুল নাট্যসমাজ। মাষ্টার স্বপনকুমার ব্যানার্জী। সাকিম রামপুর। পোষ্ট—হামিরহাটি। জেলা—বাঁকুড়া। স্থাপিত ১৯৭৬।

মাননীয় সনৎবাবু পত্রে আমার নমস্কার জানিবেন। আশা সর্বাঙ্গিন

কুশল। নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা আজ থেকে গত কয়েকমাস আগে বিষ্ণুপুর টুরিস্ট লজে আপনার আমন্ত্রণ পেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম। সাক্ষাৎ হলো, কিন্তু আমার লাভ কিছুই হয়নি। আপনি বলেছিলেন আমি সর্বদা আপনাদের পাশে আছি ও থাকবো। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার পুতুলনাট্য '৮৭ পরে আজ অবধি বন্ধ। কারণ অর্থনৈতিক। পুতুল-শিল্পের আধুনিক করণ চাই। এবং পরিবর্তন চাই। নতুবা এই সংস্থায় উন্নতি কোথায়। এবং এর জন্য প্রয়োজন অর্থ। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সরকারী সাহায্য ও সুযোগ পেলে আমি পুতুলযাত্রা সংস্থা করবো। এবং এর আদর সারা ভারতেই অনস্বীকার্য। আপনি বলেছিলেন আমি কেন্দ্রের নিকট জানাবো। তার কি হলো। আমার নিকট যে তথ্য নিলেন তা কি প্রকাশ হয়েছে। তা হলে আমায় পত্রিকা পাঠাইবেন। আর যদি কোন ব্যাঙ্ক ঋণ মঞ্জুর করতে পারেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকবো। জানেন গত দুই বছর অসহায় বেকার হয়ে দিন কাটাচ্ছি। মানসিক অবস্থার কথা থাক শুধু ভাবছি আজ আমার পাশে কেউ নেই অথচ আমি গান শুনিয়ে হাজার হাজার মানুষকে মুগ্ধ করছি। তার বহু প্রমাণ বিদ্যমান। নমস্কারান্তে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তর দেবেন।'[৩]

মনে হয় এরপরে আর কোন মন্তব্য করার প্রয়োজন হবে না।

অথবা,

এমন স্মারকলিপি দেবারই বা প্রয়োজন কেন হবে ?

পশ্চিমবঙ্গ পুতুলনাট্য সংঘ[৪]

পোঃ-বগুলা জেলা-নদীয়া

পত্রাঙ্ক—পি এন এস/১/৮২ দিনাঙ্ক—১৮ ডিসেম্বর ১৯৮২

মাননীয়,

শ্রীপ্রভাস ফদিকার। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী মহোদয় সমীপে,

পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মহাকরণ।

বিষয় : 'পশ্চিমবঙ্গ পুতুলনাট্য' সংঘের স্মারকলিপি

মহাশয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে পশ্চিমবঙ্গের উপেক্ষিত ও মুমূর্ষু ঐতিহ্যসম্পন্ন পুতুলনাচ শিল্পের একমাত্র সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ পুতুলনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে এই লোকশিল্পটির উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট লোকশিল্পীদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কল্পে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বনের স্বার্থে আপনার কাছে নিম্নলিখিত দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করছি :

দাবীসনদ :

১। বাংলার ঐতিহ্যসম্পন্ন পুতুলনাচকে সরকারের পক্ষ থেকে বিধিসঙ্গত ভাবে লোক-সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিতে হবে।

২। আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাট্য শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন কল্পে সম্ভাব্য সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। পুতুল নাচ পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনগত বিধির পুনর্বিন্যাস করতে হবে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের কোন স্থানে পুতুল নাচ প্রদর্শনী করতে হলে গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি / পৌরসভা, তহশীলদার, জে. এল. আর. ও. থানা, সি. আই. এস. ডি. পি. ও. ফায়ার ব্রিগেড, এস. ডি. ও. এবং ডি. এম.-এর অনুমতি নিতে হয় ; সেক্ষেত্রে এই অনাদৃত পুতুলনাচ লোকশিল্পে শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত, পৌরসভা বা পঞ্চায়েত সমিতির অনুমতি নিয়ে পুতুল নাচ প্রদর্শনী করতে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

৪। পুতুলনাচকে চুঙ্গিকর, প্রমোদকর, বৃত্তিকর থেকে রেহাই দিতে হবে।

৫। পুতুলনাচ প্রদর্শনী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সহজ পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ পাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং বিদ্যুৎ অফিসে জমা দেওয়া অগ্রিম টাকা নির্দিষ্ট দিন শেষে অনতিবিলম্বে ফেরৎ পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই

সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সরকার নির্ধারিত হারে ডিলারের মাধ্যমে প্রদর্শনী চলাকালীন প্রয়োজনীয় কেরোসিন তেল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। ভারতবর্ষের সকল রাজ্যে পুতুল নাচ প্রদর্শন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে অন্যান্য রাজ্য সরকারের সাথে রাজ্য পর্যায়ে যোগাযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন বাঙালী অধ্যুষিত ত্রিপুরা, আসাম এবং আন্দামান এই সুদূর রাজ্যগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচ দল পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। পুরুলিয়ার ছৌ নাচের মত নদীয়া ও অন্যান্য জেলার ঐতিহ্যসম্পন্ন পুতুল নাচকে সরকারী সহযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮। অভাবগ্রস্ত পুতুলনাচ সংস্থাগুলিকে সরকারী অনুদান দিতে হবে। সেই সঙ্গে প্রত্যেক বৎসর মরশুমের সময় লোকসানী পুতুলনাচ সংস্থাগুলিকে সরকার থেকে ঋণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। পুতুলনাচ শিল্পী পরিবারের বেকার সমস্যা সমাধান কল্পে সারা বৎসর পুতুলনাচ প্রদর্শনী করার জন্য অ-মরশুমে অর্থাৎ দল ছুটির সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত সরকারী হলে [যেমন রবীন্দ্র-সদন] পুতুলনাচ প্রদর্শনী করার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। পুতুলনাচের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান, গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে পুতুলনাচের উদীয়মান গবেষক, প্রযোজক, পালাকার, সুরকার, শিল্পী ও অভিনেতাদের উৎসাহদানে সহযোগিতা করতে হবে এবং উচ্চমানের কলাকৌশল শিক্ষাকল্পে উপযুক্ত শিল্পীদের শিক্ষালাভে সহায়তা করতে হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

সুশান্ত হালদার	অমরকৃষ্ণ দাস
সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক
॥ পশ্চিমবঙ্গ পুতুলনাট্য সংঘ ॥	॥ পশ্চিমবঙ্গ পুতুলনাট্য সংঘ ॥

১. সাক্ষাৎকারের উক্ত উদ্ধৃতিটি ৪বর্ষ ৪ সংখ্যা [১৭ অগাষ্ট ১৯৮৬] পাক্ষিক 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে। পৃ. ৪৩।

২. তদেব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ঐ পৃষ্ঠাতেই সাক্ষাৎকারের এক অংশে বলা হয়েছে যে: 'পশ্চিমবঙ্গে এই দু-ধরণের পুতুলনাচ আছে।' অর্থাৎ বক্তা দস্তানা পুতুলের সংবাদ রাখেন না অথবা ঐ প্রকারটিকে কোন মূল্য দিতে চান না। অথচ আমরা আমাদের বই-এ দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে দেখিয়েছি যে কিছু অধঃপতিত হলেও ঐ ধারা এখনও সজীব। অধিকন্তু একে এর অপমান-শয্যা থেকে তুলে এনে বিগত ৪-১১ এপ্রিল '৮৯ কোলকাতার রসিক দর্শক এবং ১০ এপ্রিল '৮৯ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-অধ্যাপকগণের সামনে উপস্থিত করে দেখানো গেছে যে একটু সহানুভূতি, অনুসন্ধিৎসা দেখালেই ও আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দিলেই এই কলা-মাধ্যমটি তার হৃতগৌরব ফিরে পেতে পারে।

৩. চিঠিটি গ্রন্থকারকে মাস্টার শ্রী স্বপনকুমার ব্যানার্জী ২৪. ১১. ৮৮. তারিখে একটি post card এ লিখে পাঠান। চিঠির কিছুই সংশোধন করা হয় নি।

৪. সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক স্বার্থে প্রদত্ত এই আবেদন পত্র বোধ হয় আজও তার তাৎপর্য হারায় নি।



ঃ উপসংহার ঃ

ক. পুতুলনাচ ও বিশ্বপ্রতিভা ঃ

পুতুলনাচ বা পুতুলনাটক নামক কলামাধ্যমের আকর্ষণ অমোঘ। পরবর্তী জীবনে বিশ্বের সেরা মানুষ হয়েছেন এমন ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের বাল্যে দেখা পুতুলনাচের স্মৃতি অতি-বৃদ্ধ এবং জ্ঞানপক্কতার কালেও ভুলতে পারেননি। আমরা এখানে মাত্র পাঁচজন বরেণ্য প্রতিভাবানের কথা বলবো যাঁরা তাঁদের জীবনে পুতুলনাচের অপরিসীম প্রভাবকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি।

প্রথম ঃ রবীন্দ্রনাথ যে সময় কোলকাতার জোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন তখন পাড়াগাঁয়ের জমিদার বাড়ীর পরিবেশ অনুযায়ী তাঁদের বাড়ীতে ঢেঁকি-পাল্কী ইত্যাদি যেমন ছিলো, তেমনি বাড়ীর ঠাকুর দালানে যাত্রা-পাঁচালী ও পুতুলনাচেরও অনুষ্ঠান হতো। তবুও যদি ধরে নিই তাঁদের বাড়ীতেই পুতুলনাচের কোন আসর বসেনি—তবুও মনে হয় বাল্যে বা কৈশোরে তিনি পুতুলনাচ [অন্তত ডাঙের পুতুল] দেখেছিলেন। সেই স্মৃতির আদলে তৈরি তাঁর হয়েছে 'তাসের দেশ' [১৯৩৩—'একটা আষাঢ়ে গল্প' [১৮৯২] রূপক গল্পের নাট্যরূপ]। এই নাটকটি যেন একটি পুতুলনাটক, এর অবয়ব সেই কথা ভাবতে আমাদের উৎসাহিত করে।

দ্বিতীয় ঃ এমন মনে করা হয় যে শেক্সপীয়রের 'মিড-সামার নাইটস্ ড্রিম' নাটকের চেতনাভিত্তিতে ছিলো পুতুলনাটকের অভিজ্ঞতা।

পণ্ডিত ফাউস্তস্ বা ফাউস্ত্। কতকগুলি অলৌকিক শক্তি দেখাইয়া, তিনি, লোকেদের চমৎকৃত করেন, এবং জনসাধারণ মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস দাঁড়ায় যে, এই সব শক্তি বা 'সিদ্ধাই' তিনি প্রাপ্ত হন ঈশ্বরদ্রোহী পাপপুরুষ শয়তানের নিকট হইতে।··· ঐতিহাসিক ফাউস্ত্ সম্বন্ধে লোকের এই ধারণা দাঁড়ায় যে, শয়তানের কাছে নিজের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া ফাউস্ত্ নানা অলৌকিক বিভূতির অধিকারী হন।··· গ্যোতে [১৭৪৯-১৮৩২] এই ফাউস্তের চরিত্রের আধারে তাঁহার জ্ঞানী অথচ অস্বস্তিপূর্ণ, সত্যানুসন্ধানী অথচ সংশয়াকুল আধুনিক-মানব নায়কের কল্পনা করেন, এবং ফাউস্তের নামেই তাঁহার নাটকের নামকরণ করেন [১৮০০-তে ১ খণ্ড, ১৮৩২-তে ২ খণ্ড]।···

"তার, অর্থাৎ গ্যোতের অনেক অনেক আগে শেক্সপীয়ারের প্রায় সমসাময়িক ইংরাজ সাহিত্যিক খৃষ্টোফর মার্লো [১৫৬৪-৯৩] জার্মেনীর এই ফাউস্ত উপাখ্যানের কাঠামোতে প্রথম ইংরাজী ভাষায় ফাউস্ত নাটক রচনা করেন। তিনি 'ফাউস্তকে' টাইট্যানতুল বীর রূপে গড়ে তুললেন। এই নাটক অচিরে জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে জার্মেনীতে ফিরে গেল, এবং সেখানে সর্বত্র অভিনীত হতে থাকল। শীঘ্রই ফাউস্ত-উপাখ্যান এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে এর উপাদান নিয়ে জার্মেনীতে আরো কয়েকটি নাট্যের সৃষ্টি হল। ক্রমে এর পুতুলনাচও জার্মেনীর সর্বত্র জনপ্রিয় হয়ে উঠল। মহাকবি গ্যোতে বাল্যে সর্বপ্রথম ফাউস্তের পুতুলনাচ দেখে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।··· এত বড় প্রতিভা নিয়ে যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি যখন বাল্যে প্রথম পুতুলনাচের মারফৎ ফাউস্তচরিত্রের পরিচয় পেলেন,···স্বভাবতঃই তিনি তার প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হলেন।"[১]

চতুর্থঃ আধুনিক কালের সবচেয়ে প্রতিভাবান ও বিতর্কিত নাট্যকার জর্জ বার্ণার্ড শ [১৮৬৬-১৯৫০] কোন প্রভাবে নয়, নিজেই একটি পুতুলনাটক লিখে ফেলেছিলেন। নাম : Shakes versus Shaw [১৯৪৯]। ঘটনাটি এই রকম : '১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে ম্যালভার্ণ ম্যারিওনেট থিয়েটারের প্রধান পরিচালক ওয়ালডো ল্যাংকাস্টার শেক্সপীয়ার ও তাঁর চরিত্রের দুটি পুতুল পাঠিয়ে ১০-১২ মিনিটের একখানি নাটক রচনা করে দেওয়ার জন্য শ'কে অনুরোধ জানান। প্রথম

অভিনয়ের অনুষ্ঠান লিপির প্রতিবেদনে নাচের পুতুলের [Puppet] কাছ থেকেই যে তাঁর নাট্যনৈপুণ্যের দীক্ষা সে-কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেন। সেখানে 'শ লেখেন: 'নাচের পুতুলের কাছ থেকেই অংশত আমি মহলা পরিচালনার কৌশল শিখেছিলাম। ওদের মুখের ভাবপ্রকাশে দর্শক কল্পনার যে অবিচ্ছিন্ন সমভাবাপন্ন গভীরতার উত্তেজনা আনে, মানব-অভিনেতার পক্ষে তার প্রকাশ অসম্ভব। ওদের একজনের অভিনয় ও সংলাপ, বা গড়িয়ে পড়া ও ডিগবাজি খাওয়া, অভিনয়কালে পূর্ণ দৃষ্টিসীমার সামনে থেকেও যেন থাকে অদৃশ্য। সংলাপ বলার সময়, পেশীর সক্রিয়তা বা মুখাবয়বের পরিবর্তন না করে ঠিক ঐ ভাবেই অদৃশ্য থাকার বিদ্যা শিখতে হয়। এই ক্রিয়ার অপারগতার জন্যই নবাগত শিল্পীরা প্রায়শই দর্শক-শ্রোতার অখণ্ড মনঃসংযোগে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানব-অভিনেতার মঞ্চে গতিবিধি ও সক্রিয়তা বা সংলাপের মধ্যে বিস্ময়ের তেমন কিছু নেই। কিন্তু কাঠের নাচিয়ে পুতুলের অলৌকিক ও চমকপ্রদ ক্রিয়াশীল ভূমিকা চিত্তাকর্ষণ না করে পারে না। এইখানেই নাচের পুতুলের মোহিনী যাদু।'[২]

নাট্যকার বার্ণাড 'শ তাঁর ঐ প্রতিবেদনের শেষাংশে পুতুল-নাটকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও গভীর চিন্তাপ্রসূত ও উদ্বেগপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন: 'সাম্প্রতিক কালে মঞ্চনৈপুণ্যের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের অবাঞ্ছিত কলাকৌশল অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পুতুলনাচের ব্যক্তিগত মানসিক বিশিষ্টতার মোহিনী শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। দূরদর্শনের পুতুলনাচও চলচ্চিত্রের মতো দৃশ্যপট ব্যবহার করতে পারছে। শব্দ-সংযোজনায় বিস্ময় সৃষ্টি করে পুতুলের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ সৃষ্টি করতে পারছেন প্রযোজকেরা। উচ্চমানের স্বরক্ষেপণকারী দ্বারা বিভিন্ন পুতুলের চরিত্রে নানা ধরনের কণ্ঠস্বরের ব্যবহার ঘটাচ্ছেন—ঠিক যেমন মানুষ-অভিনীত থিয়েটারে ঘটে। অতীতে পুতুলনাটকের পরিচালকেরা একাই বিভিন্ন পুতুল-চরিত্রে নানা প্রকারের কণ্ঠস্বর প্রক্ষেপ করতেন, উচ্চারণের ও স্বরের উচ্চাবচ ঘটিয়ে প্রত্যেকটি পুতুলকে আলাদা করে চিনিয়ে দিতে পারতেন। আমি সানন্দে স্মরণ করছি পুরাতন দিনের সেই পুতুলনাচ, যেখানে দর্শকেরা সম্মোহিত হয়ে সবকিছুকে উপভোগ করতেন। সংস্কারকেরা যদি সাবধান

না হন, তবে পুতুলনাচ তার দর্শক-শ্রোতাদের আবিষ্ট করার ক্ষমতা হারিয়ে মৃত্যুবরণ করবে।'[৩]

পঞ্চম: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় [১৯০৮-১৯৫৬], যাঁর প্রত্যয়ে ছিলো: 'মোটামুটি একটা ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে বর্তমান যুগে, কারণ, তাতে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ চিনে সেগুলি কাটিয়ে ওঠা সহজ হবে।' এমন ঋজু-প্রত্যয়ী মানিকের জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান আসে ১৯৩৬ সনে তিনখানা উপন্যাসের মাধ্যমে, যার মধ্যে দুখানা উপন্যাস 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' তাঁর সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের নামকরণ করতে গিয়ে তাঁর মনে পড়ে গেল ঐতিহ্যপূর্ণ 'পুতুলনাচে'র কথা। আর উপন্যাসটির শেষ দুটি অনুচ্ছেদ পাঠ করলে দেখা যাবে যে বিজ্ঞান-মনস্ক মানিক অদৃশ্য দেবতা বা নিয়তির সুতোর টানে মানুষ এই সংসারে পুতুলের মতো নাচছে—এই ধারণার বাইরে দাঁড়িয়ে যেন বলতে চাইছেন, প্রতিটি মানুষই পুতুল, মহাকাল পুতুল নাচিয়ে আর মানব-জীবন হলো এই নাচের রঙ্গশালা। অর্থাৎ মানিকের মতো সাহিত্যিকও বাঙালীর নিজস্ব লৌকিক ঐতিহ্যকে তাঁর প্রত্যয়ের একেবারে গোড়াতেই গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি।[৪]

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও কানাইলাল গাঙ্গুলী লিখিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত [১৯৬৭] 'ফাউস্ত' [১ ভাগ অনুবাদ গ্রন্থের 'উপক্রমণিকা' ও ভূমিকা' থেকে গৃহীত।

২. এই অনুবাদের জন্য আমরা শ্রীঅসিত ব্রহ্মের লেখা 'প্রসঙ্গ : শ' ও তাঁর পুতুল নাটক' রচনাটি ['শিল্পী সেনা' : উৎসব সংখ্যা '৮৮ ; পৃ. ২২-২৪] থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি। এই লেখার সঙ্গে শ্রীব্রহ্ম শ'-এর পুতুলনাটকটির বাঙলা অনুবাদও করে দিয়েছেন। উৎসাহী পাঠক ঐ নাটকের আরও একটি অনুবাদ পেতে পারেন : অনুবাদক ড. পল্লব সেনগুপ্ত ['অরিত্র' ৬ বর্ষ/১০-১২ সংখ্যা, ফেব্রু-এপ্রিল '৮৫]।

৩. তদেব।

৪. হয়তো আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু এখানে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত রুচিকেই এই নির্বাচনে কার্যে ব্যবহার করেছি।

